এখন ডুয়ার্স

১-১৪ মার্চ ২০১৬। ১২ টাকা

ডুয়ার্স কন্যা
ভুবনজয়ী পার্বতী বাউল

ডুয়ার্সের বন্ধ চা বাগান ভবিষ্যৎ বড়ই অস্পষ্ট

চল্লিশে পা
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

নির্লজ্জোট!
তরাই ডুয়ার্সে এবার প্রার্থী কারা?
চিন্তায় মমতা?

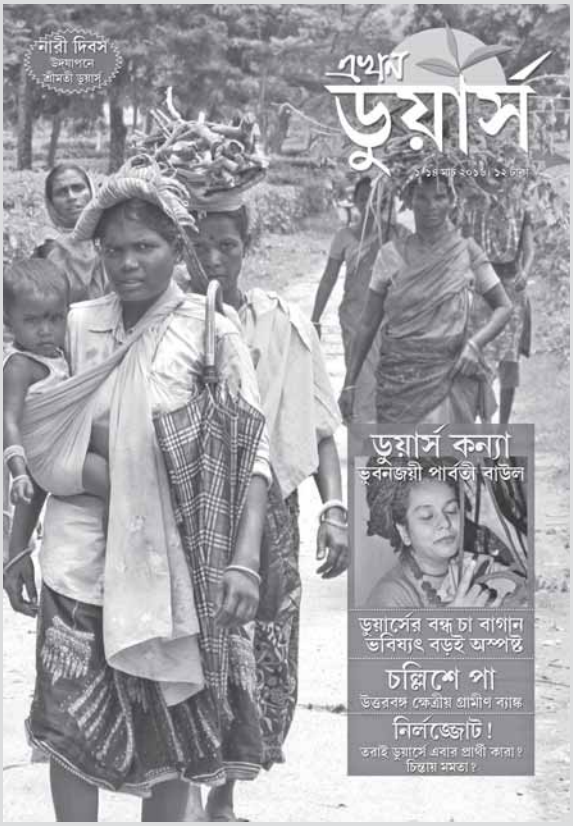

প্রচ্ছদ-ছবি রণি চৌধুরী

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'

ডুয়ার্সের নিজস্ব পত্রিকা 'এখন ডুয়ার্স' এখন পাক্ষিক, প্রত্যেক মাসের ১ ও ১৫ তারিখে ডুয়ার্সের সমাজ, রাজনীতি, পরিবেশ থেকে শুরু করে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং মেয়েদের বিশেষ পাতা 'শ্রীমতী ডুয়ার্স' নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছচ্ছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে কয়েকটি বই। প্রথম দুটি পর্যটন সংক্রান্ত, তার মধ্যে একটি ডুয়ার্সের অত্যন্ত পরিচিত মুখ গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'নর্থ ইস্ট নট আউট', অন্যটি ডুয়ার্সের নবীন কথাকার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'বাংলার উত্তরে টইটই'। এছাড়াও ডুয়ার্স তথা উত্তর বাংলার চা-বাগিচার আর্থ-সমাজ-রাজনীতি বিশেষ করে বিগত কয়েক দশক ধরে অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত চা-বাগান উঠে এসেছে সংবাদ শিরোনামে। সূচনা থেকে শুরু করে চা-বাগানের হাল আমলের পরিস্থিতির বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধের সংকলন 'চায়ের কাপে চোখের জল'। সৌমেন নাগ-এর লেখা প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবে বইমেলা প্রাঙ্গণে। তবে এবারের বইমেলায় যে বইটি ডুয়ার্সের পাঠক মহলে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলবে বলে মনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে দশজন ডুয়ার্সবাসী লেখকের সংকলন 'ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস'। উপন্যাস নিয়ে ডুয়ার্সে এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রথম। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গণে ১১-২০ মার্চ চলবে এবারের উত্তরবঙ্গ বইমেলা। 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে লেখকরা সরাসরি হাজির থাকবেন পাঠকের মুখোমুখি।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১-১৪ মার্চ ২০১৬

এই সংখ্যায়

ডাকে ডুয়ার্স
নির্লজ্জোট! ৪

দূরবিন
অশোক মন্ডল স্রেফ মিডিয়ার সৃষ্টি! ৬

রাজনীতির ডুয়ার্স
তরাই-ডুয়ার্সে প্রার্থী বাছাইয়ে এবার কেন অতি সাবধানী মমতা ১০

এখন ডুয়ার্স
গ্রেটার আস্ফালন দুই গোষ্ঠীর শক্তি প্রদর্শন? নাকি কোনও ইন্ধন? ১৪

স্পেশাল ডুয়ার্স
চল্লিশে পা রাখল উত্তরের একান্ত আপনার ব্যাঙ্ক ১৬

চায়ের কাপে চোখের জল
ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগান হাঁটছে দিশাহীন আগামীর অস্পষ্ট পথে ২০

নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ১৩
খুচরো ডুয়ার্স ২৪
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ২৮
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৪
শখের বাগান ৪৫
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৪৬
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ২২
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৭
তরাই উৎরাই ২৯
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৩

ডুয়ার্সের গল্প
নিরাশ্রয় ৩১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
নারী দিবস উদ্‌যাপনে ৩৬
নারী দিবসে প্রেরণা ৩৭
যাদের কথা রিপোর্টে নেই ৩৮
বাউল গানে ভুবনজয়ী ডুয়ার্সকন্যা পার্বতী ৪০
কৃতী কন্যা ৪২
তক্কাতক্কি ৪২
টেক টক ৪৩
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৪
মেঘপিয়োন ৪৫

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের নতুন অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

স্থানীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির নীরব সমর্থক
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা শহরের নাগরিকদের প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে ১২৮ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রাচীন পৌর সভার শিকড়টি শহরের গভীর থেকে গভীরের মাটি ছুঁয়ে এখনও সবুজ, এখনও দৃঢ়। শহরের উন্নয়ন, সংস্কার, সৌন্দর্যকরণ এর সাথে সাথে সভ্যতা, সংসকৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি ক্রমশই নানাভাবে এই শহরটিকে ধনবান করে তুলেছে এবং বাংলাকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে এ যাবৎ নানান পত্র পত্রিকা স্মারক, কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সুবাদে জলপাইগুড়ি পৌর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পত্রিকা প্রকাশক, সম্পাদকের কিছু অনুরোধ উপরোধ থেকেই যায়। বছরভর নানা উৎসব, পার্বন-বইমেলা-নাট্যমেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েই চলে। জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে ওই সকল ক্ষুদ্র পত্রিকা স্মারক বা স্মরণ সংকলন ইত্যাদিতে কিছু নিয়মাফিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সার্বিক উন্নয়ন— যেমন রাস্তাঘাট, পথবাতি, পরিবেশ রক্ষণ, পানীয়জল সহ বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সর্বতভাবেই জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির স্বাভাবিক বিষয়। তাই— নতুন করে বিষয়গুলিকে মনে না করিয়ে শহরের বিভিন্ন কলাকুশলীদের মন ও মননের সৃষ্টিশীল প্রয়াস, সংস্কৃতিবান মানুষের সৃজনশীল চিত্তপটের অনুরণ, গীত-বাদ্য-কলা-অঙ্কন-কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উক্ত সকল সংস্কৃতির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জলপাইগুড়ি শহর— এই পৌরসভা আরও প্রগতিশীল ও সম্পন্ন হয়ে উঠুক।

ধন্যবাদান্তে

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

নির্লজ্জোট !

কে বলেছে কংগ্রেস পুঁজিবাদী? কংগ্রেসই তো আমাদের পুঁজি!

আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে, মানুষ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছে নেতৃবৃন্দের নিত্য রংবদলের বহর দেখে। দেশ বা রাজ্যের মানদণ্ডকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মুখে না বললেও যাঁরা মনে মনে বিশ্বাস করেন, তাঁরা আজ অন্তত একটি বাক্যবন্ধকে নির্দ্বিধায় নয়া প্রজন্মের রাজনীতির মূল শর্ত হিসেবে আখ্যা দিতেই পারেন— 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।' নীতির কথা না হয় দেরাজেই বন্ধ করে রাখলাম, অসহিষ্ণুতার মতোই লজ্জাহীনতা রাজনীতিতে আজ যে কেবল মাত্রাছাড়া তা-ই নয়, তার চাইতেও ভয়ংকর কথা হল, এঁরা আমার-আপনার মতো ছাপোষা মানুষকেও চাইছেন দু'চোখের পাতা উপড়ে ফেলে দিয়ে এঁদের চরম নির্লজ্জতার পথকে সমর্থন ও অনুসরণ করতে। তাই আজ নিউজ চ্যানেলের স্টুডিয়োতে সজ্জিত সান্ধ্য আড্ডায় উদয়ন নাকি রেজ্জাক, কার জার্সি বদলে মানুষ বেশি ছি ছি বলেছে তা নিয়ে আলোচনা হয় না। তেমনই এ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তাবিত বাম-কং জোট রাজ্যবাসীকে কতটা পুলকিত বা কতটা হতবাক করেছে, সে খবর রাখার প্রয়োজনও সম্ভবত বোধ করেনি কেউ।

নির্বাচনের পর কেন্দ্রে সরকার গঠনে বাম-বিজেপি'র যৌথ সমর্থন বা বাম-সমর্থনে ইউপিএ সরকার গঠনের অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসীর এর আগে হয়েছে, কিন্তু সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ভোটদাতাদের প্রকৃত মত বোঝার উপায় ছিল না, কারণ ততদিনে ব্যয়বহুল নির্বাচনী যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে পুরসভা বা পঞ্চায়েত স্তরেও এমন আসন সমঝোতা বা নির্বাচন-পরবর্তী জোট বহু জায়গাতেই হয়েছে। লিখিত এবং অলিখিত দুই পথেই। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষের কাছে লোকসভা যেমন বহু দূরের বিষয়, তেমনই পুর-পঞ্চায়েত বড্ড ঘরোয়া। বিধানসভা নির্বাচন সে তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। দেশের বাকি সর্বত্র চরম শত্রু দুই দলের এ রাজ্যে প্রাক-নির্বাচনী আসন ভাগাভাগির প্রস্তাব তাই কেবল এ রাজ্যে নয়, গোটা দেশের মানুষকে অবাক করেছে নিঃসন্দেহে।

বামেরা এই জোট সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছে, তার কারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। বামেদের অতি বর্ষীয়ান নেতারাও হাড়ে হাড়ে আজ টের পেয়েছেন, একদিকে রেড ও গ্রিন টিএমসি-র অলিখিত দাপট ক্রমেই যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনই অন্য দিকে পাঁচিলে বসে পা দোলাচ্ছে লেঙুরবাহিনী— এই দুইয়ের মাঝে আসনসংখ্যা আরও কমে গেলে রাজ্যে দলের বিষয়সম্পত্তি ভিটেমাটিটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই সংকটকালে খড়কুটো ধরে বাঁচার মতোই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে কংগ্রেস দলকে। প্রায় বছর তিরিশ আগে ডাকাবুকো সিপিএম নেতাদের উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনতাম, কংগ্রেস? কংগ্রেসকে এ রাজ্যে আমরা চোদ্দো হাত মাটির নিচে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ সেই অস্পৃশ্য কংগ্রেসকেই তাঁরা কবর থেকে টেনে বার করছেন কেন? নিজেদের কবরে চলে যাওয়ার ভয়ে?

আর টানা তিন দশকের বাম-নিপীড়নকালে যেসব কং-নেতা চরম দুর্দিনেও এক হতে পারেননি, একে অপরকে কাঠি করে গিয়েছেন, তাঁরাই বা এখন একাত্ম বোধ করছেন কোন অঙ্কে? দিল্লির দশ নম্বর জনপথের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে আগামীকাল তো এঁদেরকেই ঘাসফুল ঝান্ডার নিচে দাঁড়াতে হতে পারে? পারে না? প্রশ্নের উত্তর কি তবে অস্তিত্বরক্ষা? নাকি তাঁদের ক্লীবত্বপ্রাপ্তি?

কলকাতায় বসে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকদের একটা অংশ, যাঁরা যেনতেন প্রকারেণ তৃণমূলের মুণ্ডপাত করেন, তাঁদের সহজ পাটিগণিতের অনুমান, জোট শিবিরে প্রায় শ'খানেক আসন ঢুকবে উত্তরবঙ্গ থেকেই। আরেকটা অংশ, যাঁরা বরাবর মধ্যপন্থায় থাকেন, তাঁদের বক্তব্য, তৃণমূলি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর জোটের অঙ্ক দুইয়ে মিলে শাসকদলকে খানিকটা বিব্রত করলেও করতে পারে। তৃতীয় অংশটি বলছে একটু ভিন্ন কথা— জোট হলে মুনাফা আদতে যেটুকু হবে, তার সিংহভাগটাই যাবে বিজেপি'র বাক্সে। কারণ তাঁদের মতে, কর্মীরা যতই লাফালাফি করুক, একজন পাক্কা কংগ্রেসি ভোটারের পক্ষে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে বা একজন আগাগোড়া কট্টর বাম-ভোটারের হাত চিহ্নে ছাপ দেওয়ার মানসিকতা কতটা হবে বলা মুশকিল। বিশেষ করে ক্ষমতায় পরিবর্তনের যখন কোনও সম্ভাবনা নেই (কারণ বিরোধী নেতৃত্বে কোনও মুখ নেই; বাম-শাসনে এককালে বিরোধী কংগ্রেসেরও ছিল সেই একই সমস্যা)। তখন তাদের ভোট যাবে বিজেপি'তে কিংবা নোটা'য়। আর একই অঙ্কে যেসব ভোটার কট্টর নন, যাঁদের ভোট যে কোনও দিকেই যেতে পারে, তাঁরা তৃণমূলি শাসন অপছন্দ হলে ভোট দেবেন বিজেপি'কেই, বাম-কং জোট নিয়ে তাঁদের ভরসা কম।

তবে ভোটের হাওয়া উঠতে এখনও বাকি, শেষমেশ কোন দিকে বইবে বলা মুশকিল। এই সময়ে যাবতীয় অঙ্কই অভিজ্ঞতালব্ধ অনুমানের উপরই দাঁড়িয়ে। তাই জোটের ভবিষ্যৎ কী হবে এখনই বলা হয়ত মুশকিল, তেমনই তার সাফল্যের অঙ্ক নির্ধারণ করাও কঠিন। দলীয় কর্মীদের আবেগ-উত্তেজনা, মিডিয়ার প্রচার কোনওটাই ভোটারদের মনের কথা যেমন জানতে পারে না, তেমনই তাদেরটা আদৌ প্রভাবিত করতে পারে না। সেই ভোটারদের মনের কথাকে উপেক্ষা করে স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোটের পথে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের ধৃষ্টতার পরিমাপ হবে খুব শীঘ্রই।

ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে একাধিক প্রকল্পের কাজ। সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই আরও কিছু নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

ফালাকাটা রোডের মায়ের থান থেকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত চার কিলোমিটার ওয়েন ওয়ে রাস্তা তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে।

দক্ষিণায়ন ক্লাবের দান করা জমিতে ইকো পার্কের কাজ শুরু করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। এখানে থাকবে বোটিং, টয়ট্রেনসহ বিনোদনমূলক নানা ব্যবস্থা।

বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের জন্য রিজার্ভার তৈরি ও পাইপ লাইন বসানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

'সবার জন্য গৃহ'— এই প্রকল্পের প্রথম দফার নির্মাণ কাজ শেষে ১৪৮৯টি বাড়ি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ধূপগুড়ি পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেশ কিছু মন্দির ও মসজিদের প্রাচীর সংস্কারের কাজ যেমন চলছে পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের কোচিং সেন্টারের গৃহনির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।

শুরু হয়েছে ধূপগুড়ি পৌর এলাকার প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়গুলির মিড ডে মিলের রান্নাঘর তৈরির কাজ।

পুর নাগরিকদের সুবিধার্থে ধূপগুড়ি পৌর এলাকার জনবহুল অঞ্চলে বেশ কিছু সুলভ শৌচালয় নির্মিত হয়েছে।

পুর এলাকার বহু ওয়ার্ডের নদীতে বাঁধ তৈরি ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, চলছে নতুন রাস্তা ও ড্রেন তৈরির কাজ।

পুর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ডে নতুন করে পাকা রাস্তা তৈরির জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সরু গলিগুলিকে চওড়া করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬ কোটি টাকা।

অরূপ দে
ভাইস চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

শৈলেন চন্দ্র রায়
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

ধূপগুড়ি পৌরসভা

দূরবীন

অশোক মডেল স্রেফ মিডিয়ার সৃষ্টি! আসছে ভোটে গুরুত্ব দিতে নারাজ দলীয় নেতৃত্ব

নির্বাচনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছে। রাজ্যের রাজপাট চালাতে সিংহাসনে বসবে কে? তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা পক্ষের জোটবন্ধনের রণকৌশল। এই রণকৌশল নতুন কোনও ব্যাপার নয়। রামায়ণে স্বয়ং ভগবান রাম লঙ্কা জয় করতে বানর সেনাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র মহারণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণও 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্'— ঘোষণার পরও ভরসা রাখতে পারেননি। তাঁকেও রণকৌশল নির্মাণের জন্য জোটের দিকে ছুটতে হয়েছিল। আর কৌরবকুল তো তাদের পক্ষে তাবৎ রাজন্যবর্গকে জুটিয়ে জোট করেছিল। জিতেও যেতে পারত। পরাজিত হয়েছিল কৃষ্ণের দৈবশক্তির কাছে।

জোটবন্ধন যে সবসময় নীতির উপর দাঁড়িয়ে হয় না, তার প্রমাণ তো মহাভারতের ওই মহারণের জোটের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। দুর্যোধন যে অন্যায় জেদের উপর দাঁড়িয়ে স্বজনঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, সেও তো অজানা ছিল না। দুর্যোধনের জন্মদাত্রী মাতা গান্ধারীও পুত্রের অন্যায়ের কথা স্মরণ করে তাঁকে যুদ্ধে জয়ী হবার আশীর্বাদ দিতে পারেননি। অথচ সারা ভারতের (বিশেষ করে পূর্ব ভারত) রাজন্যবর্গ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসলে সেখানে নীতি নয়, মূল কারণ ছিল, যাদবকুলপতি উত্তর ভারতের শ্রীকৃষ্ণর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্রোধ। মাতার বংশে অসুর (কংস) কুল ও পিতার বংশে (বাসুদেব) আর্য রক্তের মিশ্রণের ধারক হয়েও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব ভারতের রাজাদের (অধিকাংশ অনার্য রক্তের বাহক) অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উত্তর ভারতের (মথুরা) এই যাদবকুলপতির বিরুদ্ধে তাই তাঁরা জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, সে দিনের সেই যাদবের সঙ্গে আজকের জাতপাতের যে যাদব, তাদের কোনও মিল নেই। সেই মহাভারতের যুগে একমাত্র কৃষিনির্ভর ভারতে গোসম্পদের সংখ্যার বিচারে ধনী ও শক্তি বিচার হত। সেই বিপুল গোসম্পদের অধিকারী যাদবকুলে প্রতিপালিত বলেই গোসম্পদে বলীয়ান কৃষ্ণ এত প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকের এই জোট রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারতের এই চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা কেন? এর একটাই উত্তর, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জোটই যে আমাদের আজকের জোটবন্ধনের রণনীতির পূর্ব দিশারি। সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে সারা রাজ্যে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে— 'অশোক মডেল'। যাঁরা অশোক ভট্টাচার্যর সঙ্গে একই শহর শিলিগুড়ি নিবাসী, তাঁরা কিন্তু নির্বাচনের আগে অশোক ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে কোনও রাজনৈতিক জোটের কথা শোনেননি। এমন জোটের কথা ঘোষণাও করা হয়নি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য রাজনীতিতে অনামী কোনও এক রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যর হাতে পরাজিত হবেন— এ কথা অশোক ভট্টাচার্যর মতো অনেক সাধারণ শিলিগুড়িবাসীও বিশ্বাস করতে পারেননি। অশোকবাবু নিজেই তাঁর অবিশ্বাস্য পরাজয়ের আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। যে পরাজয়ে তাঁর মতো প্রবীণ নেতাও কমরেডদের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

মানুষ যখন কারও উপর আস্থা হারায়, তার ক্ষোভের বারুদ সবার অজান্তেই বিস্ফোরকে রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজেই জানে না, মনের সেই বারুদ কোনও সুযোগ পেলেই লম্বা লঙ্কাবাজির চেনের মতো একের বিস্ফোরণের আগুন অপর বাজিতে ছড়িয়ে পড়ার মতো বিস্ফোরণের ঐকতান সৃষ্টি করে। মানুষ দেখে, টেলিপ্যাথির মতো একের ভাবনা কেমন করে অপরের ভাবনার মধ্যে অনুরণিত হয়।

একই ঘটনা তো দেখা গিয়েছে ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের সেই ফল্গুধারার সময়। উপর থেকে কেউ বুঝতে পারেনি, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, রাজন্য ভাতা বিলোপ এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের জল্লাদদের হাত থেকে উদ্ধার করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে স্বর্ণপালকের মুকুট পরিহিতা ইন্দিরা গান্ধির পরাজয়কে সাধারণ মানুষ এমনভাবে আমন্ত্রণ জানাবে। সেটা তো কেউ বিশ্বাস করেনি।

ক্ষোভ ছিল জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভ যে মানুষের মনে এমনভাবে সূক্ষ্ম কোষের অনুভূতির জালে ছড়িয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। তার প্রমাণ সে দিনের প্রফুল্লকুমার সেন, জ্যোতি বসুদের প্রস্তাব। তাঁদের ৪৯ শতাংশ এবং প্রফুল্লবাবুদের জনতা দলের ৫১ শতাংশ আসনের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই এককভাবে বিধানসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের ভরাডুবি ঘটিয়ে আজকের সিপিএম'কে ৩৪ বছরের রাজত্ব কায়েম করার

সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

অশোক ভট্টাচার্য যখন রাজ্যের পুরমন্ত্রী হলেন, তখন আর দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সেই মেঝেতে নেতা ও সাধারণ কমরেডদের কমিউনে থাকা কমিউনিস্ট পার্টি নয়, ক্ষমতায় থাকার সুযোগে বিশাল বিশাল ভবনের মালিকানার কমিউনিস্ট পার্টি। মোগল সম্রাটদের রাজপথে ভ্রমণের সময় সান্ত্রিদের ‘তফাত যাও’ হুকুমদারিতে খালি করে দেওয়া রাজপথের মতো লাল চক্ষুর আলো লাগানো গাড়ি আর সাইরেনের সেই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হুঁশিয়ারি রাজপথ শূন্য করার দাবি নিয়ে ধাবিত হয়।

উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অভিধায় একসময় অশোকবাবু পুলকিত হতেন, গৌতমবাবু এখন হন। তবে এটা যে কলকাতাকেন্দ্রিক প্রভুদের পক্ষে তাদের করদ রাজ্যের প্রতিনিধিদের জন্য এক টুকরো মাখা রুটি ছুড়ে দেওয়ার মতো, সেটা কিন্তু তাদের বোঝা দরকার। মহাকবি কালিদাসকে ভারতের শেকসপিয়র বলার অর্থ, ঔপনিবেশিক কৌলীন্যে কালিদাসের বিশাল প্রতিভাকেই খণ্ডীকরণ করা। কারণ এটা বলার অর্থ, মহাকবি কালিদাস ইংরেজ কবি শেকসপিয়রের প্রতিভার এক ভগ্নাংশমাত্র। উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অভিধার মধ্যেও কলকাতায় এক উন্নাসিকতা তথা সুপ্ত ঔপনিবেশিক মনোভাবের প্রকাশ পায়— ‘তুমি আর যা-ই হোক, সারা বাংলার নেতা হতে পারো না।’ এটা অনেকটা সেই মোগল সম্রাটদের মনসবদার নিয়োগের মতো। উত্তরবঙ্গের জায়গা উত্তরবঙ্গেই। রাজধানী কলকাতার কথা যেন ভুলেও মনের মধ্যে জায়গা না দেওয়া হয়। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আসন কলকাতা তথা গঙ্গার ওপারের নেতৃত্বের জন্যই সংরক্ষিত। উত্তরবঙ্গ থেকে যেন কেউ এই স্বপ্ন দেখতে না চায়।

একটা বিশেষ সংবাদমাধ্যমের বদান্যতায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অশোক মডেল শব্দবন্ধটি। কারণ বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের পুর, পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের নির্বাচনে সারা রাজ্য জুড়ে যখন তৃণমূলের অশ্বমেধের ঘোড়া একের পর এক কেন্দ্রে বিজয়কেতন উড়িয়ে চলেছে, তখন শিলিগুড়ির পুর নির্বাচনে ও শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে সেই অশ্বমেধ ঘোড়া অশোক ভট্টাচার্যর সিপিএমের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের আগে এখানে অশোকবাবু কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনও জোটের কথা ঘোষণা করেননি। এই নির্বাচনে তৃণমূল যেমন এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, তেমনি সিপিএম নেতৃত্বে বামফ্রন্টও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বাইরে থেকে বিজেপি ও কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থন ও একজন তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করার পর এক নির্দল কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ সমর্থনে পুর বোর্ড গঠন করেছে। এটাকেই বলা হচ্ছে অশোক মডেল! অর্থাৎ সব তৃণমূল বিরোধী শক্তিগুলি তাদের নিজেদের তাগিদেই পুরসভা গঠনে এগিয়ে এসেছে। নয়ত তাদের জয় তৃণমূলের বোর্ড গঠনে শামিল হতে হত অথবা আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ বকলমে তৃণমূলের হাতেই শিলিগুড়ি পুরসভাকে তুলে দিতে হত। তা যে তারা করেনি, তার পিছনে অশোকবাবুর কোনও সুকৌশলী ভাবনা নেই, তৃণমূল সবার কাছে প্রবল প্রতিপক্ষ শত্রু বলে চিহ্নিত বলেই বিরোধীরা এই সমবেত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বলে নিতে হয়, অশোকবাবুর মন্ত্রিত্বকালে তিনি শিলিগুড়ির উন্নতির জন্য কিছু করেননি এমন অভিযোগ তাঁর অতি বড় শত্রুও করে না। তবু তাঁর পরাজয় ঘটার পিছনে সে সময় সিপিএমের তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জনবিক্ষোভের পাশাপাশি অশোকবাবুর অহংবোধের উগ্র প্রকাশভঙ্গিও দায়ী। একই রকমভাবে বলা যায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব তাঁর শহর শিলিগুড়ির উন্নতির জন্য কিছু করেননি এমন অভিযোগ কেউ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবু পুর ও মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রীর নিজের শহর ও মহকুমার ভোটদাতারা তাঁর দলের এই বিজয়স্রোতের বিরুদ্ধে উলটো পথে হেঁটে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এর জন্য তাঁর দলেরই বহু মানুষ বলতে চাইছে, এটি কোনও অশোক মডেলের ফল নয়, এই ফল আসলে মহকুমায় গৌতম বিরোধী জনরোষের পরিণাম। অর্থাৎ এখানে কাজ করছে গৌতমবাবুর দলের মধ্যেই এক গৌতম বিরোধী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

অশোক মডেল নিয়ে সংবাদমাধ্যম যে পরিমাণ প্রচার করছে, তাতে কিন্তু অশোকবাবু তাঁর দলেরই রাজ্য নেতৃত্বের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন। হয়ত হয়েছেনও। আজকে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে জোট গঠনের দাবি সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব তুলেছেন, অশোকবাবু শিলিগুড়ি পুর বোর্ড গঠনে এই জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় অনেকটা বেশি এগিয়ে আছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি পুর বোর্ড গঠনে অশোকবাবু যে বিজেপি কাউন্সিলরের পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছেন তা রাজ্য নেতৃত্ব জেনেও বোর্ড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনায় চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন।

অশোক মডেল নিয়ে সংবাদমাধ্যম যে পরিমাণ প্রচার করছে, তাতে কিন্তু অশোকবাবু তাঁর দলেরই রাজ্য নেতৃত্বের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন। হয়ত হয়েছেনও। আজকে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে জোট গঠনের দাবি সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব তুলেছেন, অশোকবাবু শিলিগুড়ি পুর বোর্ড গঠনে এই জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় অনেকটা বেশি এগিয়ে আছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি পুর বোর্ড গঠনে অশোকবাবু যে বিজেপি কাউন্সিলরের পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছেন তা রাজ্য নেতৃত্ব জেনেও বোর্ড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনায় চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন।

আবার অন্য দিকে অশোক মডেলের এই প্রচার যে দক্ষিণবঙ্গের নেতারা খুব একটা খোলা মনে মেনে নিতে পারছেন না তা অশোকবাবু প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও আপন অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। দক্ষিণবঙ্গের নেতারা, তা সে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস যে দলেরই হন না কেন, তাঁরা ধরে নেন, প্রাজ্ঞতা ও নেতৃত্বদানের প্রতিভায় তাঁরা উত্তরবঙ্গের নেতাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছেন। সিপিএম-সহ সব দলের নেতৃত্বই রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক। সেখানে উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তিক শহরের অশোক ভট্টাচার্যকে খুব বেশি হলে উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলা যেতে পারে। আরেকটু বেশি হলে তাঁকে দলের রাজ্য কার্যকরী কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য করা যায়, কিন্তু তাঁর ভাবনাকে দলের ভাবনার মডেল বলে মেনে নিয়ে, নীতি হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের অহংবোধকে আঘাত করা চলে না। তাই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির দলের পর্যবেক্ষক রূপে দক্ষিণবঙ্গ থেকে নেতাদের পাঠানো হয়, কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পর্যবেক্ষক পাঠানোর ঘটনা কিন্তু কদাচিৎ ঘটে।

তাই কলকাতার বাম-নেতাদের মতে, অশোক মডেল বলে আলাদা করে ভাবার কিছু নেই। শিলিগুড়িতে সাফল্যলাভ মানে সেই নীতি অন্যত্রও একইভাবে সফল হবে, তার কোনও যুক্তি নেই। তবে শিলিগুড়িতে আসন্ন নির্বাচনে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি— এটুকু বলা যায়। তা সে জোট হোক বা না হোক।

সৌমেন নাগ

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে

শিলিগুড়ি ১১-২০ মার্চ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস

প্রথম খণ্ড

নিঃশব্দ প্রতীক্ষার কাল
চোমং লামা

অনুপ্রবেশ
তুষার চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্র নেই দ্বীপ
অর্ণব সেন

সাতটি তারার তিমির
জীবন সরকার

ভাগাভাগির সময়
দিবাকর ভট্টাচার্য

৩ নং কলদের অনুপম কাহিনি
বিপুল দাস

বাতিল নিঃশ্বাসের স্বর
অলোক গোস্বামী

প্রাণভোমরার গান
সাগরিকা রায়

সারথির সকাল থেকে রাত
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

দুলাল আর মাধ্যমিক
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

পাওয়া যাবে 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে
দাম ২৫০ টাকা

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

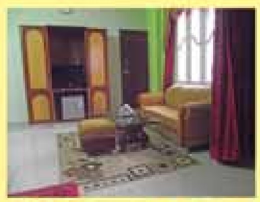

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC,
Non AC , Conference Hall

HOTEL Green View

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (O), 9434756733 (M)

বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফল করতে দায়বদ্ধ কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের আদর্শই আমাদের প্রেরণা। তাঁর দেখানো উন্নয়ন কর্মসূচিই আমাদের পাথেয়। সেই পথে হেঁটেই এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশে এগিয়ে চলেছে এই পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-পরিবহণ কার্য বিভাগ। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাসন যোজনাসহ সমস্ত রকম কর্মসূচি ও সফল প্রকল্প রূপায়ন করতে আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।

বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদ সহ—

স্বপন কুমার পাত্র
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১নং ব্লক

খোকন মিঞা
কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত ও পরিবহণ কার্য বিভাগ
কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি।

কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

ধলুয়াবাড়ি, কোচবিহার

তরাই-ডুয়ার্সে প্রার্থী বাছাইয়ে এবার কেন অতি সাবধানী মমতা

নিয়ন্ত্রণহীন গোষ্ঠীকোঁদল, শিলিগুড়িতে পরপর হার এবং সবশেষে বিরোধী জোটের প্রাবল্য তৃণমূল নেত্রীর কপালে কিঞ্চিৎ হলেও যে ভাঁজ ফেলেছে— এ কথা তাঁর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করা অনেকেই স্বীকার করছেন। আপাতদৃষ্টিতে সত্যিকারের সংকটে না ফেলতে পারলেও উত্তরবঙ্গ এবার তাঁর কাছে 'প্রেস্টিজ ফাইট'— যে লড়াইতে হারলে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতেও হয়ত বিস্বাদ লাগবে। পরিস্থিতি এখন এরকমই। তার ফলে উত্তরের প্রার্থী বাছাইতে তিনি বহুবার আগেপিছে চিন্তাভাবনা করছেন। ঝটিতি কোনও সিদ্ধান্তও নিতে চাইছেন না। দক্ষিণবঙ্গের গতবারে জয়ী প্রার্থীদের অপরিবর্তিত রাখার ফর্মুলা উত্তরে এসে তিনি মানতে পারছেন না। কারণ এখানে কংগ্রেসের নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক আছে গোড়া থেকেই, এবং বামেদের একটা দীর্ঘ দিনের ভিত তো আছেই। কাজেই মুখে 'কাঁচকলা' কিংবা 'কেয়ার করি না' বললেও জোটের বিরুদ্ধে জুতসই প্রার্থী দিতে তিনি যে এবার যথেষ্ট সময় নিচ্ছেন তা বলাই বাহুল্য। ফলত গতবারের বিজয়ী হয়েও এখনও প্রচারে নামতে পারছেন না কেউই। ঘন ঘন গোপনে বা প্রকাশ্যে কলকাতায় গিয়ে সাধ্যমতো 'ক্যাচ' লাগিয়ে বা 'প্রণামি' দিয়ে কিংবা টুকটাক 'আশ্বাস' পেয়েও নিশ্চিত হতে পারছেন না কোনও নেতাই। কারণ যতটুকু খবর মিলছে, তালিকা তৈরি করছেন মমতা নিজেই, গুটিকয় সঙ্গী কেবল তাঁকে নানা তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করছেন মাত্র।

যেমন শিলিগুড়ি সম্ভবত সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূল নেত্রীর কাছে। তথাকথিত অশোক মডেলের সমুচিত জবাব এবার তিনি দিতে চাইবেনই। দুর্নীতির অভিযোগে রুদ্রনাথের নাম আগেই মুছে ফেলা হয়েছে। অশোক ভট্টাচার্যকে ফাইট দিতে যে যোগ্য প্রার্থীর প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। যত দূর নির্ভরযোগ্য খবর মিলছে, দূত মারফত প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব গিয়েছে শহরের কয়েকজন মান্যগণ্য নাগরিকের কাছে। নান্টু পাল দিদির স্নেহভাজন, প্রার্থী হওয়ার জন্য হাতের পাঁচ তো তিনি রয়েইছেন, কিন্তু মিডিয়ায় যা-ই গুজব রটুক, গৌতম দেব মমতার 'গুড বুক' থেকে মোটেও সরে যাননি। গৌতম দেবের মারফত শিলিগুড়ি পুরসভার নির্দল কাউন্সিলর অরবিন্দ ঘোষকেও প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জানা যাচ্ছে। প্রাক্তন তৃণমূল কর্মী অরবিন্দবাবুর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও পরিষ্কার ইমেজ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। গৌতম দেবের চেলাচামুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে তিনি গত পুরভোটে দল ছেড়ে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে জয়ী হন এবং দলের বিরুদ্ধে সিপিএম'কে সমর্থন করে পুর বোর্ড গঠনে সাহায্য করেন। সেই অরবিন্দ ঘোষকে বিধানসভায় প্রার্থী করে এবার পালটা বাজিমাত করতে চাইছে তৃণমূল।

তবে এও শোনা গিয়েছে, অরবিন্দবাবুকে পাশের ফুলবাড়ি কেন্দ্রে জোটপ্রার্থী হওয়ার অফার দিয়ে রেখেছেন অশোকবাবুরাও। অরবিন্দবাবু বা যে-ই হোন না কেন, শিলিগুড়ির মতোই ফুলবাড়ি কেন্দ্রে এবারও যদি গৌতমবাবুই ফের প্রার্থী হচ্ছেন ধরে নেওয়া হয়, তবে এবারের লড়াই যে বেশ কঠিন হবে তা অজানা নয় স্বয়ং প্রার্থীরও। সৌরভ চক্রবর্তীর বাহিনীকে সমঝে, সদ্য বড় অপারেশনের শারীরিক ধকল সামলে নিজের মেশিনারিকে সঠিকভাবে চালনা করাটা যে বেশ শক্ত কাজ তা গৌতমবাবু বিলক্ষণ জানেন। তবে ময়দানে তিনি নেমে পড়েছেন, নেত্রীর ঘোষণার আগে ওয়ার্মআপ সেরে নিচ্ছেন, বেরিয়ে পড়ছেন আবার আগের মতোই উদ্যমে।

কিন্তু এসব সত্য হলেও শেষ মুহূর্তে বাইরের কোনও তারকাকে এনে শিলিগুড়িতে দাঁড় করানোর প্ল্যান নেই তো মমতার? কিংবা এমন কারও কথা ভাবছেন, যিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও ক্লিন ইমেজসম্পন্ন কেউ? এমন সব প্রশ্ন ঘুরছে দলের অন্দরেই। কেবল তৃণমূল সমর্থকই নন, বিরোধী দলের লোকেরাও মানছেন, মমতার পক্ষে যে কোনও সারপ্রাইজ চাল দেওয়াটা এখন আর অস্বাভাবিক নয়। আর শিলিগুড়ির আসন যে তিনি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবেন না, তাও স্পষ্ট বিরোধীদের কাছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় কংগ্রেসের প্রাধান্য অনস্বীকার্য এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট। মালবাজার কেন্দ্রে সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে দুর্ভাবনা না থাকলেও বিরোধী শিবির দুর্বল থাকায় প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকটাই নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় তৃণমূলকে। নাগরাকাটা কেন্দ্রের জোসেফ মুন্ডার অঙ্ক পরিষ্কার— জোটপ্রার্থী হলে কংগ্রেসেই থাকবেন, না হলে তৃণমূলের অফার পেলে দল পালটাবেন। তবে যে-ই তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়ান না কেন, নাগরাকাটাতে তাঁকে লড়তে হবে জবরদস্ত।

উত্তরে মমতার চ্যালেঞ্জ

- ❑ গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ন্ত্রণের বাইরে
- ❑ অশোক মডেলের সাফল্য
- ❑ চা-বাগানের নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট
- ❑ তৃণমূলীদের মাত্রাছাড়া দাপট
- ❑ নানা প্রতিশ্রুতির অসারবত্তা
- ❑ বাম-কং জোটে ভোটারদের আস্থাজ্ঞাপনের আশংকা

উত্তরে মমতার প্লাস

- ❑ ঘন ঘন সফরে সতর্ক প্রশাসন
- ❑ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নতির লক্ষণ
- ❑ পর্যটনে কিঞ্চিৎ গতিময়তা
- ❑ পাহাড়ে শান্তি
- ❑ ব্যক্তিগত ক্যারিসমা অম্লান
- ❑ পরিকাঠামোর উন্নয়ন-রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ

মিডিয়ায় যা-ই গুজব রটুক, গৌতম দেব মমতার ‘গুড বুক’ থেকে মোটেও সরে যাননি। ফুলবাড়ি কেন্দ্রে এবারও যদি গৌতমবাবুই ফের প্রার্থী হচ্ছেন ধরে নেওয়া হয়, তবে এবারের লড়াই যে বেশ কঠিন হবে তা অজানা নয় স্বয়ং প্রার্থীরও। সৌরভ-পন্থীদের ও সদ্য অপারেশনের ধকল সামলাতে হবে।

উত্তরবঙ্গের নতুন যুবরাজ হিসেবে আখ্যা পাচ্ছেন যিনি, সেই সৌরভ চক্রবর্তীর জন্য আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রই নির্দিষ্ট হয়েছে তা বোধহয় এখন নিশ্চিন্তে বলা যায়। তবে নিজের যাবতীয় যোগ্যতা প্রমাণ করার একমাত্র পথ যে এবারের ভোটে যে কোনও উপায়ে জেতা সেটা তিনি সম্যকভাবে অবহিত।

সবচেয়ে কঠিন চিত্র বোধহয় কোচবিহার জেলাতেই। দলের কর্মী বা নেতাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, এখানে শত্রুতা নিজেদের মধ্যেই, খোলাখুলি এবং নগ্নভাবে। জেলার একচ্ছত্র অধিপতি তথা সবচেয়ে বেশি সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে নাকি আজ জেলার সব বিধায়ক ও নেতা।

কারণ চা-বাগান বলয়ে এখন রাজ্য সরকার বিরোধী সেন্টিমেন্টই স্বাভাবিক। আর জলপাইগুড়ি সদরের চিত্রটি বেশ পরিষ্কার। সেখানে সৌরভ ও গৌতম বাহিনীর লড়াই এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি আদি তৃণমূল নেতা ধর্তিমোহন রায়ের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, যার বিরুদ্ধাচরণ করবার ইচ্ছে সম্ভবত কারওই থাকবে না। জলপাইগুড়িতে জোটপ্রার্থী হিসেবে এবার সুখবিলাস বর্মা দাঁড়ালে তৃণমূলকে তার যোগ্য জবাবদাতা খুঁজতে হবে। এবং বলাই বাহুল্য, গোষ্ঠীর লড়াই যে জায়গায় রয়েছে, সেখান থেকে এবার সঠিক প্রার্থী ঠিক করা যে নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ হবে তা আর আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে হয় না শাসকদলকে।

উত্তরবঙ্গের নতুন যুবরাজ হিসেবে আখ্যা পাচ্ছেন যিনি, সেই সৌরভ চক্রবর্তীর জন্য আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রই নির্দিষ্ট হয়েছে তা বোধহয় এখন নিশ্চিন্তে বলা যায়। কেননা জোটের চিত্র যতই পরিষ্কার হয়েছে, জোট বিরোধী কংগ্রেস বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়ের আলিপুরদুয়ার থেকে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা ততটাই ক্ষীণ হয়েছে। সরাসরি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা না বললেও দেবপ্রসাদের সঙ্গে সৌরভ তথা তৃণমূলের যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া হয়েছে তা রাজনৈতিক মহলে রটনা হলেও কিছু তো বটেই। তবে দলীয় নেতৃত্বের কাছে নিজের যাবতীয় যোগ্যতা প্রমাণ করার একমাত্র পথ যে এবারের ভোটে যে কোনও উপায়ে জেতা সেটা তিনি সম্যকভাবে অবহিত। আর কালচিনি, কুমারগ্রাম বা মাদারিহাটে প্রার্থী যে-ই হোক না কেন, চা-বাগানের সমস্যা, লাল পার্টি থেকে আসা নয়া তৃণমূলিদের দাপট, চোরাশিকার ও পাচারে প্রত্যক্ষ যুক্ত থাকার অভিযোগ শাসকদলকে কতটা স্বস্তির লড়াই দেবে তা নিয়ে এবার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অতএব এখানেও যে নতুন মুখ দলনেত্রী চাইছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবে উত্তরে দলের সবচেয়ে কঠিন চিত্র বোধহয় কোচবিহার জেলাতেই। দলের কর্মী বা নেতাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, এখানে সাইনবোর্ড কংগ্রেস বা ডানা-ভাঙা বামেরা নয়, শত্রুতা এখানে নিজেদের মধ্যেই, খোলাখুলি এবং নগ্নভাবে। জেলার একচ্ছত্র অধিপতি তথা সবচেয়ে বেশি সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে আজ জেলার সব বিধায়ক ও নেতা। দিনহাটার প্রার্থী বাছাই ও ঘোষণা সবার আগে সেরেছেন দলনেত্রী, তেলে-জলে মেশাতে যে বেশ বেগ পেতে হবে তা জেনেও। অনেকের মতেই, রবীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি ও দাপটকে খর্ব করার জন্য দিদির এই কৌশলী চাল। এবার যে গতবারের মতো সব সিটের প্রার্থী তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী হচ্ছে না, সেটা রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বুঝে গিয়েছেন। সিতাই আসনটি ছিল কংগ্রেসের, এবার সেখানে আসছে নতুন মুখ। তবে আসনটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় অনেক নেতারই ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মাথাভাঙা আসনে বিনয়কৃষ্ণ অপরিবর্তিত থাকবেন ধরে নেওয়া যায়, তবে হিতেন বর্মন যদি ফের শীতলকুচি আসনের টিকিট না পান, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনিতেই গতবার ভোটে খুব সামান্য তফাতেই জিতেছিলেন হিতেনবাবু। আর তার পরবর্তীকালে নানা কারণে জেলার সাংগঠনিক রাজনীতিতে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আসা এই নেতা। প্রার্থী বদল হবার সম্ভাবনা বাকি আসনেও। নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ গতবারের জেতা সিট হলেও হারা আসনগুলির সঙ্গেই মুখের অদলবদল চাইছেন নেত্রী। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে দলের ক্ষতিকে যতটা সম্ভব কমানো যায়, সেই উদ্দেশ্যেই।

এর মধ্যে বাজারে একটা মজার খবর চাউর হয়েছে। কোচবিহারের কোনও এক তরুণ তৃণমূলি বিধানসভার টিকিট পাওয়ার জন্য দলের কাছে নাকি প্রস্তাব রেখেছেন— তাঁকে টিকিট দিলে জেলার সব ক'টি আসনে প্রচারের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব তিনি বহন করবেন, দলকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন তিনি। আরও অবাক করার মতো বিষয় হল, সাধারণ নাগরিক, যাঁদের কানে এই খবর যাচ্ছে, তাঁরাই নিশ্চিত হচ্ছেন যে, সেই নেতাই টিকিট পাচ্ছেন। এতে কতিপয় মানুষের ব্যাখ্যা হল, যার মালকড়ি খরচের দম আছে, সে-ই টিকিট পাবে। গত পাঁচ বছরে তৃণমূল প্রার্থী নির্বাচনের এই নিয়মই অনুসরণ করছে এবং তার ফলে মানুষের মনে সেটাই বদ্ধমূল হয়ে আছে। সব জল্পনা, আভাস ইত্যাদির শেষে তাই একটাই শর্ত বা সতর্কীকরণ— গতবারের মতোই এবারও যদি প্রার্থী নির্বাচনের চাবিকাঠি মুকুল রায়ের হাতে থাকে, তবে যাবতীয় চিত্র উলটে যেতে পারে।

ডুয়ার্স-তরাইয়ের হবু তৃণমূল প্রার্থীরা তাহলে এবার মনে মনে কী প্রার্থনা করছেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

মালবাজার তাহলে সত্যিই বদলে যাচ্ছে। শহর জুড়ে উঁচু উঁচু পথবাতি, ত্রিফলা আলো, পিচঢালা চওড়া রাস্তাঘাট, পাকা নিকাশি নালা, সুভাষ মোড়ে আলো-ধ্বনির যুগলবন্দির ফাউন্টেন ও পৌরসভা পরিচালিত পুরনো প্যাথলজিক্যাল ল্যাব-এর সংস্কার করে ঝা চকচকে করে গড়ে তোলা, ঘড়ি মোড়ের সৌন্দর্য্যায়ন, শহরের খেলাধুলার উন্নতিতে পৌরসভার সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা মালবাজারের সাংস্কৃতিক বিকাশে সবরকম সাহায্যের হাত প্রসারিত করা— এই সমস্ত কিছুই একবাক্যে জানান দিচ্ছে যে সত্যিই বদলে যাচ্ছে মালবাজার। অথচ কয়েকবছর আগেও সরু সরু রাস্তা, অধিকাংশ কাঁচা নালা, প্রায়ান্ধকার গলিঘুঁজি নিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগোচ্ছিল মফস্বলের গন্ধমাখা পশ্চিম ডুয়ার্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর মালবাজার। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পৌরপতি শ্রী স্বপন সাহার নিরলস পরিশ্রমে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মালবাজার। মালবাজারের উন্নয়ন এখন আর শুধু এই মহকুমা বা জেলার নয় সারা রাজ্যের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে সদিচ্ছা এবং নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ মালবাজারের উন্নয়ন। ঘোর নিন্দুকও মালবাজার শহরের উন্নয়নকে অস্বীকার করতে

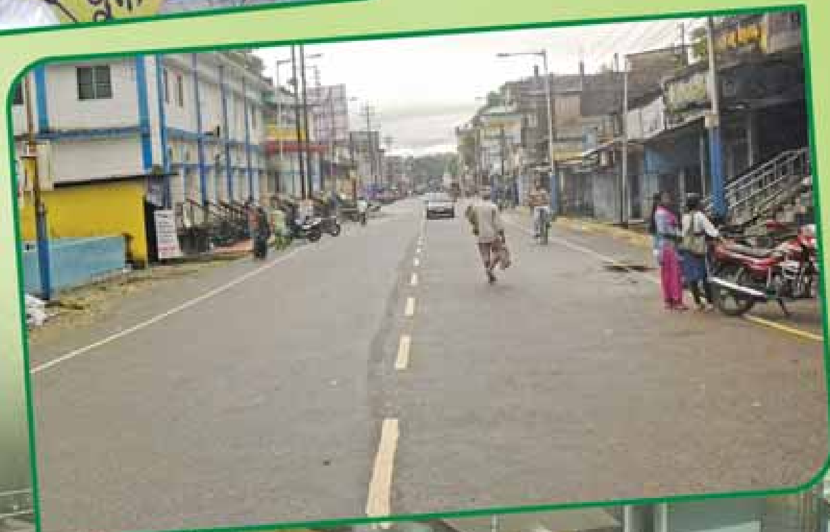

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

পারবে না। তাই বলে কি মালবাজারের উন্নয়নের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। কিছুটা অবশ্যই হয়েছে। থমকে যাওয়া উন্নয়নের রথ বিগত পাঁচ বছরে গতিশীল হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। যার মধ্যে অন্যতম মালবাজারে খেলাধূলার জন্য একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ। কিন্তু জমির সমস্যা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়! যদিও স্বপন সাহার নেতৃত্বাধীন মাল পৌরসভা আন্তরিক ভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় অচিরেই এই প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে মালবাজারে তৈরি হবে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। তবে স্টেডিয়াম কিংবা মঞ্চ যতদিন না তৈরি হচ্ছে ততদিন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে মাল পৌরসভা যেমন খেলাধূলার উন্নতিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তেমনই এই শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

যেমন গত ডিসেম্বরে মাল অ্যাক্টোওয়ালা পরিচালিত মাল নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণকারী বহিরাগত দল সমূহের থাকার জায়গার ব্যবস্থা কিংবা যাত্রা অনুষ্ঠানে সাহায্য করা ছাড়াও ভাষা শহিদ স্মরণে ক্যালটেক্স মোড়ে সুদৃশ্য স্মারক নির্মাণ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন তার মধ্যে অন্যতম।

এভাবেই উন্নয়নের রথে সওয়ার হয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় শহর মালবাজার উন্নতির শিখর ছুঁয়ে হয়ে উঠবে ডুয়ার্সের রানি আর তখন গর্বিত মালবাসী দুচোখ ভরে দেখবে বদলে যাওয়া শহর মালবাজারকে!

ডুয়ার্স নাট্যচর্চায় আলোর দিশারি অ্যাক্টোওয়ালা

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জনপদের মতোই মালবাজারের নাট্যচর্চার ইতিহাস স্মরণযোগ্য। তার মধ্যে যাত্রাও একটি উল্লেখযোগ্য আসন দখল করেছিল মালবাজারের সংস্কৃতিচর্চায়। এসবই ছিল বিক্ষিপ্তভাবে, ধারাবাহিক নাট্যচর্চা কখনওই প্রতিভাত হয়নি মালবাজারে। তবে সেই বিক্ষিপ্ত নাট্যচর্চাও উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

২০১১ সালে মালবাজারের নাট্য ইতিহাসে একেবারে অন্যভাবে, অন্য ভাবনায় জারিত হয়ে উত্থান হল মালবাজারের নতুন নাট্যদল অ্যাক্টোওয়ালা-র। নাট্যদলের ভাবনার প্রতিটি স্তরে এল পেশাদারি মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গি। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলো, আবহর প্রতিটি ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে, সমঝোতার সরল পন্থাকে পরিহার করে, মহলাকক্ষের নাট্যশৃঙ্খলাকে বজায় রেখে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে উঠল অ্যাক্টোওয়ালা। এক কথায়, অ্যাক্টোওয়ালা-র মূল্যবাণীর অনুসরণে বলা যায়— শুধুমাত্র নাটকের জন্য নিবেদিত নাট্যসচেতন সংস্থার অভ্যুদয়।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধাংশু বিশ্বাসের হাত ধরে পথ চলার পাশাপাশি সম্পাদকের বলিষ্ঠ লেখনীর স্পর্শে প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং আধুনিক কাহিনিকারদের উপন্যাস, ছোটগল্পের নাট্যরূপের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল উপস্থাপনায়। পাশাপাশি ডুয়ার্সের জনজাতির নিজস্ব সমস্যাগুলির উপর ভিত্তি করে রচিত ও উপস্থাপিত হল পথনাটক, শ্রুতিনাটক, অণুনাটক, যা অবশ্যই ডুয়ার্সের নাট্যমুকুটে এক অনন্য পালক। স্বল্পকালের এই পরিধিতে ইতিমধ্যেই উপস্থাপন করেছে— 'অনধিকার প্রবেশ', 'বৃদ্ধাশ্রম', 'একাদশী বৈরাগী', 'বিরতির পরে', 'ফেরা', 'ভোকাট্টা', 'একটি মৃত্যু এবং...' প্রমুখ ছোট-বড় নাটক। অর্জন করেছে নাট্যসচেতন, জনসচেতন, পরিবেশবিদ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন।

পাশাপাশি অ্যাক্টোওয়ালা প্রতি বছর আয়োজন করে নাট্যোৎসব, যেখানে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের নাট্যদলগুলির ধারাবাহিক নাট্য উপস্থাপনা চাক্ষুষ করে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে নতুন আঙ্গিকের দৃষ্টিভঙ্গিসচেতন নাট্যদর্শক, যা অবশ্যই মালবাজারের গর্বের বিষয়। ওই উৎসবেই প্রকাশিত হচ্ছে সংস্থার বার্ষিক মুখপত্র 'দর্পণ' পত্রিকা। তৈরি হয়েছে অ্যাক্টোওয়ালা-র শিশু নাট্য বিভাগ। ২০১৫ সালে হাওড়ার অনুযুগ নাট্যসংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে নাট্য শিবির। দু'দিনের এই নাট্য শিবির থেকে উঠে আসা শিশুদের দিয়ে অভিনীত হয়েছে 'টুনটুনিলো' শিরোনামে ছোট্ট নাটক, যা এতদঞ্চলের দর্শককে মুগ্ধ করেছে। এরই সঙ্গে অ্যাক্টোওয়ালা-র শাখা সংগঠন হিসেবে গঠিত হওয়া ডামডিম যুব নাট্য সংস্থার শিশু বিভাগ নাট্য উপস্থাপনায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে তাদের অভিনয়ের গুণে।

অ্যাক্টোওয়ালা মালবাজারের পাশাপাশি নাটক মঞ্চস্থ করেছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিশির মঞ্চ, কলকাতা, ওদলাবাড়ি, গয়েরকাটা অঞ্চলে। বোঝা যায়, সংস্থার সভাপতি দিলীপ দাস, কোষাধ্যক্ষ সাধন দাশগুপ্ত, সহসভাপতি সুব্রত ঘোষ, সহসম্পাদক সুরজিৎ বসু কতখানি দায়বদ্ধ তাঁদের দলের প্রতি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ডুয়ার্সের পরিচিত বেশ কিছু পুরনো নাট্যদল,যাদের প্রযোজনা প্রায় ছিল না বললেই চলে, সেসব দলও অ্যাক্টোওয়ালা-র অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রযোজনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এটাই বোধহয় অ্যাক্টোওয়ালার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

এতসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এ কথাটাও উল্লেখ্য যে, নিজেদের সীমিত ক্ষমতায় (বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে) তারা নিবিষ্ট চিত্তে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের নাট্য প্রযোজনা। যদি কোনও সরকারি অনুদান পাওয়া যেত তাহলে আরও উঁচুমানের নাট্য প্রযোজনায় ডুয়ার্সের নাট্যচেতনা সমৃদ্ধ করতে পারত বলেই মনে হয়।

সনৎ বসু

ভোটের আগে গ্রেটার আস্ফালন দুই গোষ্ঠীর শক্তি প্রদর্শন? নাকি কোনও ইন্ধন?

বৃহত্তর কোচবিহারের দাবি আন্দোলনের নামে একটানা প্রায় আশি ঘণ্টা রেল অবরোধে। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও ঘটেছে তিন রেলযাত্রীর মূল্যবাণ প্রাণহানী। সামনে বিধানসভা ভোট বলেই কি প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেন না? আমজনতার সমস্যা মোকাবিলা করাটাই তো তার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা প্রশ্ন তুলে দিল। সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই সমর্থন প্রশ্রয় দেওয়া। ভোট বৈতরণী পার হলেও তা কিন্তু মারাত্মক আকার নিতে পারে।

আবেগকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিন পর উত্তাপের আঁচ কোচবিহারে। প্রায় ঢিল-ছোড়া দূরত্বে দু'-দু'টি কর্মসূচিকে ঘিরে অশান্তির পরিবেশ। দু'টি কর্মসূচির উদ্যোক্তা একই নামের। সংগঠনদ্বয়ের দাবিও অভিন্ন। তবে সংগঠনদ্বয়ের কর্মী-সমর্থকদের নেতার নামে জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় কে কার অনুগামী। দু'টি সংগঠনের লক্ষ্য গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য গঠন। বাস্তবতা কিংবা যৌক্তিকতা থেকে বহু দূরে তাঁরা হেটে চলেছেন কেবলমাত্র আবেগকে পুঁজি করে। নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে পিঠোপিঠি দু'টি কর্মসূচিতে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ।

এ যেন অনেকটা রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আর উলুখাগড়ারা? বিভিন্ন স্টেশনে ভোগান্তির চরমে। কেউ রওনা হয়েছিলেন পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে, কেউ বা চিকিৎসার লক্ষ্যে বহুদিন আগে থেকে রিজার্ভেশন করে নিজের নিজের মতো করে প্রোগ্রাম সাজিয়েছিলেন লাখ লাখ জনতা। কিন্তু বংশীবদন বর্মনের নেতৃত্বে গ্রেটার কোচবিহার পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন-এর এক গোষ্ঠীর ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনে অনির্দিষ্টকালের রেল অবরোধ হয়ে ওঠে সবকিছুর অন্তরায়। অন্য দিকে নিউ কোচবিহার স্টেশনের অদূরে চকচকা শিল্প তালুকের সম্মুখের ময়দানে লক্ষ মানুষের জমায়েতের আহ্বান গ্রেটার কোচবিহার পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন-এর অপর গোষ্ঠীর নেতা অনন্ত মহারাজের। ২১-২২ ফেব্রুয়ারি তাদের সমাবেশ ঘিরে সাজো-সাজো রব। অনন্ত রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনকারীদের একাংশের স্বঘোষিত মহারাজ। তিনি চকচকায় রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রাজত্ব পরিচালনার প্রত্যাশী। এই সমাবেশ নাকি তাঁর প্রথম ধাপ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে সব থেকে বড় প্রশ্ন, উভয় পক্ষ এই সময়কাল বেছে নিলেন কেন? আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে দর কষাকষিকে সামনে রাখার লক্ষ্যেই কি উভয় পক্ষের এই আয়োজন? আমরা জানি, ২০০৫ সালের ২০ ডিসেম্বর সড়ক অবরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক রক্ত ঝরেছিল। সেই আন্দোলনে দু'জন আন্দোলনকারী ও তিনজন পুলিশকর্মী প্রাণ হারান। এর জেরে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা বংশীবদন বর্মনকে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর জেলবন্দি থাকতে হয়। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর তিনি মুক্তি পান। এই সময়কালে অর্থাৎ ২০০৯ সালে জেলবন্দি অবস্থায় এবং ২০১৪ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর লোকসভা নির্বাচনে ১ নং কোচবিহার লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি সাফল্যের মুখ দেখতে পারেননি। অথচ এই সময়কালে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের সমর্থকদের কাছে মহারাজা হিসাবে আখ্যায়িত অনন্ত রায় প্রায় নিঃশব্দে সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। মতপার্থক্যের কারণে পৃথক সত্তা বজায় রাখা অনন্ত মহারাজ প্রকাশ্যে বড় ধরনের কোনও আন্দোলনে না গেলেও সভা-সমাবেশ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে কার্পণ্য করেননি। এমনকি রাজপ্রাসাদের আদলে চকচকায় প্রাসাদ নির্মাণ করে, 'নারায়ণী সেনা' নামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে শিব-চণ্ডী পূজার মাধ্যমে এক কথায় রাজকীয় স্টাইলে সরল, সাদাসিধে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে আবেগতাড়িত করতে বংশীবদনের চাইতে কয়েক কদম

ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে আমল পাচ্ছিলেন না বংশীবদন। অন্য দিকে অনন্ত রায় ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। ভোটের আগে শাসকদলকে বেকায়দায় ফেলে বিনিময় মূল্য আদায় করে নেওয়ার সুচতুর ফন্দি ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। পুলিশের লাঠি বা গ্যাসে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলেই বিপাকে পড়বে প্রশাসন তথা তৃণমূল সরকার। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ফন্দি আঁটার পিছনে যদি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের অদৃশ্য মদত থেকেও থাকে, তবে তা কিন্তু ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এগিয়ে যান। যদিও বংশীবদনের ন্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে ভোট বয়কট কর্মসূচি বিভিন্ন নির্বাচনে জারি রাখলেও তা যে খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেছে, তাও নয়।

এমতাবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্য গঠনের দাবিকে সামনে রেখে— এই ধরনের কর্মসূচি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিকে যে বিনষ্ট করবে তা বলার অবকাশ রাখে না। তবে প্রশ্ন একটাই, যে ইস্যুকে সামনে রেখে তারা মানুষকে সংগঠিত করছে, সভা-সমাবেশ কিংবা আন্দোলনে শামিল করছে, তার জুতসই রাজনৈতিক মোকাবিলা কোথায়? সরকারিভাবে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা কিংবা দাবির অসারতা প্রমাণে যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের অবতারণা কেন করা হচ্ছে না, সে প্রশ্ন আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন দেখা দিয়েছে ৮০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রেল লাইন আটকে রেখে হাজারের উপর ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত করা কিংবা অবরোধে আটকে পড়ে রেলযাত্রীর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার দৃশ্য দেখেও সরকারের রহস্যজনক নিস্পৃহতা— তবে কি ভোট রাজনীতির কারণেই?

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আপাত বিশ্লেষণ হল, জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করলেও ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা, ধারাবাহিকতার অভাব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে আমল পাচ্ছিলেন না বংশীবদন। অন্য দিকে অনন্ত রায় ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। ভোটের আগে শাসকদলকে বেকায়দায় ফেলে বিনিময় মূল্য আদায় করে নেওয়ার সুচতুর ফন্দি ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। পুলিশের লাঠি বা গ্যাসে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলেই বিপাকে পড়বে প্রশাসন তথা তৃণমূল সরকার। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ফন্দি আঁটার পিছনে যদি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের অদৃশ্য মদত থেকেও থাকে, তবে তা কিন্তু ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্য সরকারের সঙ্গে নয়, সরাসরি কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার দাবি থেকে অনেকেই গন্ধ পাচ্ছেন বিজেপি উসকানির। কারণ তাঁদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার এদের দাবিকে যদি গোর্খাল্যান্ডের মতোই সহমর্মিতাসহ বিবেচনার আশ্বাস দিলেই তার থেকে ফায়দা ভোটের বাক্সে তোলার চেষ্টা করবে বিজেপি। অন্য দিকে এরকম পরিস্থিতিতে বাম-দলগুলিকে সন্দেহের বাইরে রাখতে চান না অনেকে। তৃণমূলের একটি মহল তো পরোক্ষেই দোষারোপ করছে সিপিএম দলকে এই অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য। যদিও বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, বাম বা বিজেপি কেউই নয়, খোদ তৃণমূল নেতৃত্বই কোচবিহারে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণাম এবং তার উপর বাম-কং জোট লড়াইয়ের ফল ভোটের বাক্সে ভাল হবে না জেনেই, গ্রেটার-পন্থীদের ভোট যাতে বিরোধী শিবিরে না পড়ে, তার জন্য পরোক্ষে এই ধরনের হঠাৎ বিক্ষোভের উসকানি দিচ্ছে। অবরোধের ফলে নৈরাজ্য এবং মানুষের হয়রানি সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসনের নিস্পৃহতাই নাকি তা প্রমাণ করছে। কোচবিহারের তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ যদিও জেলার দ্বন্দ্বে দীর্ণ তৃণমূল নেতাদের এহেন সুচারু কৌশলক্ষমতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাইরের উসকানির সম্ভাবনা খারিজ করে দেননি।

রাজনীতিকরা ঘোলা জলে মাছ ধরবেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কারণ ভোট বড় বালাই। কিন্তু যে প্রশ্নটা উত্তর-প্রান্তীয় বঙ্গে অত্যন্ত জরুরি তা হল, কামতাপুরি, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন কিংবা এই ধরনের ভাবনার মধ্যে দিয়ে কখনও রাজবংশী, কখনও কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি দাবি ও তার সপক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস— দিনের শেষে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যাচ্ছে। এটা করা হচ্ছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণের নামে যা হচ্ছে তা বিচ্ছিন্নতাবোধকে কেবলমাত্র পরিপুষ্ট করছে না, বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। নির্বাচন আসবে-যাবে, কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়ার জন্য এই সকল শক্তিকেই সমাদর করার ভাবনা রাজনৈতিক দলগুলি যদি এখনই ত্যাগ না করে, তবে উত্তরের আকাশ যে অচিরেই কালো মেঘে ঢেকে যাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক দলগুলির এখনও যদি সংবিৎ না ফেরে, তবে শেষের সে দিন সত্যিই হয়ে উঠবে ভয়ংকর।

বিশেষ প্রতিনিধি

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

চার জেলার ব্যবসা চার হাজার কোটি টাকার

ডুয়ার্সবাসীর আবেগ সফল করে চল্লিশে পা রাখল উত্তরের একান্ত আপনার ব্যাঙ্ক

সেদিনও ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রামের কাছাকাছি ব্যাঙ্কের শাখা ছিল। কিন্তু গরিব ছাপোষা মানুষের রুটিরুজির জন্য দরকারি ঋণের ব্যবস্থা ছিল জটিল। তাদের জন্য যে ব্যাঙ্ক শুরু হল গ্রামের মানুষ শুরুতে কিন্তু সন্দেহের চোখেই দেখল। চকচকে দালানের বদলে কুঁড়েঘরে ব্যাঙ্ক কিংবা টেবিলে গ্রিল লাগিয়ে ক্যাশ কাউন্টার— এহেন ব্যবস্থা সন্দেহই আনে। কিন্তু একদিন কৃষিকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে যে উন্নয়ন ঘটাল **উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক** তা এক কথায় দৃষ্টান্ত। উপেক্ষা-কটাক্ষ নিয়ে শুরু করে আজ সাধারণ মানুষের একান্ত আপন হয়েছে এই ব্যাঙ্ক। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাফল্যে, কৃষি উন্নয়নে এবং ছোট ব্যবসায় যতটা সহায়ক হতে পেরেছে সেটাই তার অহঙ্কার। সেই কারণেই বোধহয় এই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ কেউ আটকে রাখেন না। ব্যাঙ্কের সুরক্ষায় কোনও নিরাপত্তা কর্মী নেই, তা সত্ত্বেও লুঠপাটের মতো অনভিপ্রেত ঘটনা উল্লেখ করার মতো নয়। ডুয়ার্স ও পাহাড়ের সাধারণ মানুষের আবেগ-ভালবাসা না থাকলে যা কখনও সম্ভব নয়।

রবিশস্য চাষে ডুয়ার্সে উন্নতি ঘটেছে, আলু চাষের বাড়বাড়ন্তের কারণে অনেকগুলি হিমঘর স্থাপিত হয়েছে— এর পিছনে কিন্তু নিঃশব্দে ছায়ার মতো লেগে রয়েছে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর অবদান।
ছবি: অমিতেশ চন্দ

অ্যাকাউন্ট ওপেন

এমনটা চোখেই পড়েছে ডুয়ার্সের প্রান্তে প্রান্তে। ছোট্ট কোনও দু'কামরার বাড়িতে কিংবা কোনও নড়বড়ে ঘরে অথবা টিনের ঘরকে গড়েপিটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যাঙ্কের শাখা। আশপাশের দু'-দশ মাইলের মধ্যে ওই একখানাই ব্যাঙ্ক। নিরাপত্তার বিশেষ বালাই নেই। ব্যাঙ্ক বলতে চোখের সামনে যে চকচকে ব্যাপার ভেসে ওঠে, তার কণামাত্র নেই। কিন্তু আছে, সক্রিয়ভাবেই আছে। হরেক অবিশ্বাস, তাচ্ছিল্য, কটাক্ষ সহ্য করে রাষ্ট্রায়ত্ত আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসা করে চলেছে সেই ব্যাঙ্ক।

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। কেবল জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং আর কোচবিহার— এই চারটে জেলাতে যার ব্যবসার পরিমাণ এখন চার হাজার কোটি টাকা। এই তিন জেলার বাইরে আর যেতে পারে না এই ব্যাঙ্ক। এইটুকুই তাদের 'টেরিটরি'। এটাই আইন। প্রতিটি গ্রামীণ গোত্রের ব্যাঙ্কেরই এমন 'নোটিফায়েড' বা বিধিবদ্ধ এলাকা আছে। তাই বাইরে ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসা করতে পারে না।

আসলে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হল 'পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক'। দেশে তিন ধরনের পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক আছে। স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সাবসিডায়ারি ছ'টা ব্যাঙ্ক, ন্যাশনালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং তিন নম্বর হল 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫২টি। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তার মধ্যে অন্যতম। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পিছনে ইন্দিরা গান্ধির অন্যতম লক্ষ্য ছিল অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনা। ভাবা হয়েছিল যে, গ্রামীণ মানুষকে উপযুক্ত পরিষেবা দিতে পারবে ব্যাঙ্কগুলি। কিন্তু বাস্তবে যখন বোঝা গেল যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি গ্রামে পৌঁছাতে ব্যর্থ, তখন ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগ 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'-এর কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ভাবনারই ফসল হল দেশ জুড়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির আবির্ভাব। সরকার চেয়েছিল যে, এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির প্রশাসনিক দিকটা হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মতো, কিন্তু এর গ্রাহক হবেন সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহকের মতো গ্রামের মানুষরা। তবে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ধারণায় অবশ্য 'লো কস্ট' ব্যাপারটা যুক্ত ছিল। এ হল কম খরচের ব্যাঙ্ক। বাড়ি ভাড়া কম দেবে। বেতনও কম দেবে।

১৯৭৫ সালে গান্ধিজির জন্মদিনে দেশ জুড়ে পাঁচটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই রাজ্য থেকে সেই তালিকায় ছিল কেবল 'গৌড় গ্রামীণ' ব্যাঙ্ক। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর যাত্রা আরও দু'বছর পর শুরু। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। আগেই বলেছি যে, 'উত্তরবঙ্গ' বিশেষণটি থাকলেও এই ব্যাঙ্কের কাজের এলাকা ছিল কেবল উত্তরের তিনটি জেলা। বর্তমানে জেলা ভাগের কারণে হয়েছে চারটি। হেডকোয়ার্টার কোচবিহারে।

'বেরুবাড়ি' আর 'নিশিগঞ্জ'— এই উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর প্রথম দু'টি শাখা। কিন্তু সে দু'টি শাখার কর্মচারীরা ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মী। এখানে জানিয়ে রাখি যে, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর শেয়ারহোল্ডার হল তিনটি। ৫০ শতাংশ ভারত সরকারের, ৩৫ শতাংশ হল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এবং ১৫ শতাংশ রাজ্য সরকারের। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হল উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর স্পনসর ব্যাঙ্ক। এই স্পনসর ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা অবশ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ভেদে বদলে যায়।

তাই স্পনসর ব্যাঙ্কের কর্মী হিসেবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মীরা গোড়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর কাজ চালাতেন। নিজস্ব কর্মী নিয়োগের পদ্ধতি শুরু করতে গিয়ে গোড়ায় কিছু বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে। যে গ্রামে শাখা, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের চাকরি দেওয়ার দাবি তুলে আদালতে মামলা করা হয়। কিন্তু শেষ অবধি বিচার বিভাগ সে দাবি নাকচ করে দেয়। এর পরে পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগে আর বাধা ছিল না। ১৯৭৯-এ উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তিনটি পদে নিজস্ব কর্মী নিয়োগ করে। পদগুলি ছিল— ম্যানেজার, ফিল্ড সুপারভাইজর এবং ক্লার্ক।

অবিশ্বাসের হাওয়ায়

গ্রামের মানুষের আর্থিক বিকাশে সহযোগিতার লক্ষ্যে ডুয়ার্সে কাজ করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শুরুতেই কিন্তু গোলাপ বিছানো পথ পায়নি। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধি সরকার এই জাতীয় ব্যাঙ্ক চালু করলেও, ১৯৭৭-এ মোরারজি দেশাইয়ের সরকার ক্ষমতালাভের পর 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' প্রকল্পটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' আসলে আর্থিক দুর্নীতির একটি প্রতিষ্ঠান, যা আগের সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গঠন করে গিয়েছে। আসলে দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা চলাকালীন 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তা ছাড়া কেউ কেউ রটিয়েছিল যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধির সরকার আসলে গ্রামের ভোট দখল করবে।

এইসব কারণে জনতা সরকারের আমলে 'দান্তেওয়ারলা কমিটি' গঠন করে 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' ব্যবস্থার উপর রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিলেন। কমিটি রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল যে, সন্দেহের কোনও কারণ নেই। গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে কাজ করাটাই এই জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির মূল লক্ষ্য এবং তারা সে কাজটাই করছে। এ ছাড়াও রিপোর্টে বিস্তর প্রশংসা করা হয়েছিল এই জাতীয় উদ্যোগের। ফলে প্রকল্প জারি থাকল।

কিন্তু সরকারের সন্দেহ দূর হলেও যাঁদের জন্য ব্যাঙ্ক, সেই গ্রামের মানুষরা গোড়াতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে খুব সন্দেহের চোখে দেখতেন। ওই সময় সদ্য সদ্য একটা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি ঘটে গিয়েছে। মানুষ গোড়াতে এই ব্যাঙ্ককে চিটফান্ড ভাবতে শুরু করে। অবশ্য তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, চকচকে দালানের বদলে প্রায় কুঁড়েঘরে ব্যাঙ্কের শাখা, টেবিলে গ্রিল আটকে ক্যাশ কাউন্টার বানানো আর টাকা রাখার জন্য একখানা সিন্দুক— এসব দেখে তাঁরা বিশ্বাসই করতে চাননি যে, এটা সরকারি উদ্যোগে গঠিত একটা ব্যাঙ্ক।

সরকারের লোকেরাও যে গোড়ায় এই ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করত, সেটাও বলা যায় না।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এই চার জেলায় মোট ব্রাঞ্চের সংখ্যা এখন ১৪২। এর মধ্যে সবচাইতে উঁচুতে অবস্থিত ব্রাঞ্চ দুটি রয়েছে দার্জিলিঙের লেবং ও কালিম্পঙের গিডডাবলিং-এ। তেমনি বাংলাদেশ সীমান্তের গা ঘেঁষে রয়েছে কুচলিবাড়ি ও দেওয়ানগঞ্জ ব্রাঞ্চ। এখন সর্বত্রই পাকা রাস্তা হওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু জায়গায় পৌঁছনো সুগম হয়েছে। তবে ভুটান সীমান্তে অবস্থিত টোটোপাড়া ব্রাঞ্চটির মতোই সৌরিলি ও চটেরহাট ব্রাঞ্চে পৌঁছতে এখনও কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

যদিও শাখাগুলিতে সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা হত ‘সরকারি উদ্যোগে গঠিত’ বা ওই জাতীয় কিছু— তবুও দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকল্পের ফান্ড গড়ে সরকারি দপ্তরগুলি অন্য ব্যাঙ্কে টাকা রাখলেও উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এ কোনও ফান্ডের টাকা রাখত না। এই অবস্থায় প্রচারের দরকার ছিল খুব। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। প্রচারের জন্য কোনও ফান্ড বরাদ্দ নেই। এক কথায়, গ্রামের মানুষ থেকে সরকারি আমলা— সবার কাছেই উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একটা রহস্যময় আর সন্দেহজনক বস্তু। অথচ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক রয়েছেন সদস্য হিসেবে!

বেতনের ব্যাপারটাও হয়ত সন্দেহের আরেকটা কারণ ছিল। এইসব ব্যাঙ্কের কর্মীদের বেতনক্রম স্থির হয়েছিল রাজ্য সরকারের বেতনের মাপকাঠিতে। ফলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের তুলনায় এখানে বেতন ছিল কম। বেতন কম মানে ব্যাঙ্ক ভাল নয়— এই ধরনের সরল সমীকরণ মনে করে নিয়েছিলেন অনেকে।

কর্মই ধর্ম

এই অবস্থায় ব্যাঙ্কে চাকরি করতে আসা একঝাঁক তরুণ এবং মেধাবী ছেলেমেয়ে কিন্তু ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন নেই। টিভিতে বিজ্ঞাপন তো অভাবনীয়। নিজস্ব প্রচারের বাজেট নেই— তা সত্ত্বেও শুরুর দিকের কর্মীরা জান লড়িয়ে দেন। প্রচারের জন্য কয়েকজন ম্যানেজার মিলে একটা ফন্দি বার করেছিলেন সে সময়। ডিআরআই নামক একটা স্কিমে গরিব মানুষদের চার শতাংশ সুদে ধার দেওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। এই স্কিমে প্রচুর মানুষকে রিকশা কেনার জন্য ধার দেওয়া হয় এবং রিকশার পিছনে লিখে দেওয়া হয়— ‘উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক’-এর অমুক শাখার নিকট দায়বদ্ধ’। এ ছাড়াও ‘ভারত সরকারের সংস্থা’ কথাটা বাধ্যতামূলকভাবে লিখে দেওয়া হত। এই পরিকল্পনাটা খুব ভাল উতরে যায়। ব্যাঙ্ক যথেষ্ট প্রচার পেতে শুরু করে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির গ্রামাঞ্চলে আমরা কয়েক হাজার রিকশা ঋণ দিয়ে নামিয়েছিলাম।

পাশাপাশি কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামীণ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অচিরেই দেখা যায় যে, ডুয়ার্সে গ্রামের মানুষকে ঋণ দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এমন ক্ষেত্রগুলিতে ঢুকে পড়ছে, যেখানে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির পদার্পণ ছিল অসম্ভব। তাই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ডুয়ার্সে জনপ্রিয় হতে বেশি সময় নেয়নি। ১৯৮০ সালে ব্যাঙ্কের বাণিজ্য প্রথমবার এক কোটি টাকা অতিক্রম করে। সেবার কোচবিহারের অফিসে মিষ্টি খেয়ে নিজেরাই নিজেদের অভিনন্দিত করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাদের কাজের নমুনা দেখে কিছু কিছু লিখতে শুরু করেন। এর ফলেও আমরা মানুষের চোখে পড়তে শুরু করি।

ফার্মারস’ ক্লাব গড়েও আমরা বেশ সাফল্য পাই। গ্রামের মানুষ কীভাবে সহজে ঋণ পেতে পারেন এবং কীভাবে সহজে তা পরিশোধ করতে পারেন, তা গুছিয়ে গ্রামে গ্রামে বলার জন্য আমরা এই ক্লাবগুলি তৈরিতে উৎসাহ জোগাই। দশ-পনেরোজন কৃষক মিলে এমন একটা ক্লাব গড়ে গ্রামে আমাদের হয়ে প্রচার চালাত এবং নিজেরাই উপকৃত হত। এইরকম প্রায় তিনশো ক্লাব বর্তমানে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে জড়িত। মূলত ‘নাবার্ড’-এর পরিকল্পনা ছিল এই ধরনের ক্লাব গঠনের। ‘নাবার্ড’ চেয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে ব্যাঙ্কের কার্যকারিতার প্রচার করা। আগে এই কাজটা করত ‘গ্রামীণ বিকাশ ভলান্টিয়ার’ নামক স্বেচ্ছাসেবীরা। ‘নাবার্ড’ উদ্‌বোধনের সময় ইন্দিরা গান্ধি এমন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কৃত করেছিলেন। পুরস্কৃতদের একজন ছিলেন মিরিকের কাছে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর ‘সৌরিলি’ শাখার এক নেপালি যুবক।

এটা ১৯৮২ সালের কথা। অর্থাৎ শুরুর পাঁচ বছরের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উল্লেখ করার মতো জায়গায় চলে এসেছিল। ১৯৮৭-৮৮ সাল জুড়ে দার্জিলিঙে চলেছিল জঙ্গি আন্দোলন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাতটি শাখায় আন্দোলনকারীরা ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্তে আসামাত্র আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শাখাগুলির পুনর্গঠন সম্পন্ন করেছিলাম বলে ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্ক’ আর সরকার আমাদের প্রভূত প্রশংসা করে সে সময়ে।

ক্রেডিট নিতেই পারি

শুরুতেই বলেছি যে, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর বাণিজ্যের পরিমাণ তার সীমিত এলাকার মধ্যেই চার হাজার কোটি টাকা স্পর্শ করে ফেলেছে। এবার ভেবে দেখুন, এই ব্যবসা সে এমন একটা ভূখণ্ডে করছে, যেখানে শিল্প বলতে কিছু নেই। যা ছিল, সেই চা-শিল্পও সংকটের মুখোমুখি। এক কথায়, আর্থিক ‘পোটেনশিয়ালিটি’ বলতে যা বোঝায় তা এই ব্যাঙ্কের টেরিটরিতে কোথায়? আবার, এই ব্যাঙ্ক আর আমানত ওই ‘নোটিফায়েড’ এলাকার মধ্যেই দাদন হিসেবে দিতে পারে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মতো যদি নিজের আমানত দেশের সর্বত্র ব্যবহার করতে পারত উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, তবে গল্প আলাদা হত। তা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছর ধরে টানা উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক লাভের মুখ দেখে আসছে। লাভের পরিমাণ অতি সাম্প্রতিককালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে জানি, কিন্তু সেটা কেবল এই ব্যাঙ্কের সমস্যা নয়। বস্তুত, দেশ জুড়ে সব ব্যাঙ্কই বর্তমানে একটা চাপের মুখে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু গর্ব আমরা করতেই পারি। আর রবিশস্য চাষে ডুয়ার্সে উন্নতি ঘটেছে, আলু চাষের বাড়বাড়ন্তের কারণে অনেকগুলি হিমঘর স্থাপিত হয়েছে— এর পিছনে কিন্তু নিঃশব্দে ছায়ার মতো লেগে রয়েছে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর অবদান। কৃষি আর ছোট ব্যবসা, ডুয়ার্সে এই দু'টি ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক যা করতে পেরেছে দৃষ্টান্তযোগ্য। অবশ্য শুরুর দিকের সেই উপেক্ষা, সেই কটাক্ষ আর সহ্য করতে হয় না গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে। এখন অবস্থা অনেক বদলেছে। ডিজিটালাইজেশন হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল যে, জলপাইগুড়িতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব যখন কোনও ব্যাঙ্ক রাজি হচ্ছিল না, তখন আমার শিক্ষক ও তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের অন্যতম নেতা সুবোধ মিত্র আমাকে বলেছিলেন যে, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যদি প্রাইমারি টিচারদের বেতন সরবরাহের দায়িত্বটা নেয়, তবে দপ্তরের সাশ্রয় হবে। কারণ, তখন সে বেতন হত পোস্ট অফিস মারফত এবং খরচ হিসেবে দিত পাঁচ শতাংশ।

উর্ধ্বতন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে আমি সে দায়িত্ব উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর উপর

ন্যস্ত করায় সফল হয়েছিলাম বলে আজও আনন্দ পাই। আসলে তখন আমরা কাজটাকে নিয়েছিলাম সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে।

আমরা এখন 'বিশ্বাস'

আজ চল্লিশ বছরের মাথায় যাঁরা উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর কর্মী হিসেবে কাজ করতে আসছেন, তাঁদের কাছে বাগানটা অনেক সাজানো। গোড়ায় ব্যাঙ্কগুলির মিটিং-এ আমরা থাকতাম পিছনের সারিতে সসংকোচে। সে মিটিং-এ থাকতেন জেলাশাসকসহ ব্যাঙ্ক আর সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তারপর বুঝেছি, ব্যাঙ্ক আসলে যা করতে চায়, তা আমরাই ঠিকঠাক করছি। তখন আমাদের কথা ওরা শুনতে শুরু করল। নয়ের দশকের গোড়ায় দেখা গেল, আমাদের প্রতিনিধিদের আসতে দেরি হবে জেনে জেলাশাসক সেই মিটিং দু'ঘণ্টা পিছিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবেই গুরুত্ব বাড়ছিল আমাদের।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে আমাদের বেতনক্রমও উন্নত হয়েছে। বেতন সংক্রান্ত এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আমি বোঝাতে পেরেছিলাম যে, ডুয়ার্সের একটি গ্রামীণ জনপদে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর একটি শাখার কাজের সঙ্গে অপর কোনও একটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাজের কোনও পার্থক্য নেই। তাহলে কেন বেতনের বৈষম্য হবে? বস্তুত, ডুয়ার্সের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কাছাকাছি যে ব্যাঙ্কই থাকুক না কেন, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশ পরিমাণে স্থানীয় মানুষের রুজির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

শহরেও আছে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। এর প্রধান কারণ অবশ্য শহরে শাখা থাকলে প্রশাসনিক কাজে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু ব্যবসার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবেন, শহরের অনেক ব্যাঙ্কের সঙ্গেই আমরা পাল্লা দিয়েই চলছি। নিজের ভবন তৈরির জন্য এই ব্যাঙ্কের কোনও বাজেট নেই। তাই হয়ত 'পহলে দর্শনধারী' কথাটার মর্যাদা বজায় রাখতে পারি না। কিন্তু গুণের বিচার করলে দেখবেন, ডুয়ার্সের কোনায় কোনায়, প্রান্তে প্রান্তে অবস্থিত মলিন চেহারার নিরাপত্তাহীন বাড়িগুলিতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর এক-একটি শাখা অনায়াসে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করে যাচ্ছে। ভারী লেজারের বদলে সেখানেও নিঃশব্দে এসে গিয়েছে কম্পিউটার। দেখবেন, কীভাবে গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবসে নিজের টানে এসে বাড়িয়ে দিচ্ছে সহযোগিতার হাত। কারণ এই গোষ্ঠীগুলি স্বনির্ভর করার জন্য ঋণ দিয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। অন্য ব্যাঙ্কগুলির বিরাট অঙ্কের টাকা শোধ না করার কাহিনি আপনারা জানেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর সেই অপচয় নেই। তার দেওয়া ঋণের অর্থ কৃষক আটকে রাখে না। চাষের মধ্যে দিয়ে সে টাকাকে ব্যবহার করে।

ডুয়ার্স ও পাহাড়ের গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভরতা প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গত চার দশক ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ঋণদান ও পরিশোধের অঙ্কে এই ব্যাঙ্ক রাজ্যের অন্যতম সেরা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মনে পড়ে যে, ১৯৯৩ সালের আলিপুরদুয়ারে ভয়ংকর বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য আমরা নানাভাবে কাজ করেছি। ত্রাণ পাঠানোর কাজের সঙ্গে যুক্তি ছিল আমাদের ব্যাঙ্ক।

অ্যাকাউন্ট ক্লোজড

সব শেষে বলি, আমাদের লোকবল বড়ই কম। আর গ্রামে-প্রান্তরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর এমন অনেক শাখা আছে, যেখানে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। হয়ত স্থানীয় মানুষের ভালবাসার কারণেই লুটপাটের মতো অনভিপ্রেত ঘটনা কম ঘটে। তবুও বলছি যে, ন্যূনতম নিরাপত্তা প্রয়োজন। প্রচারের দিকেও জোর দেওয়া উচিত।

আর যদি বলেন উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর ভবিষ্যৎ কী? তবে বলব, ভবিষ্যতে এই ব্যাঙ্ক হয়ত এই চেহারায় থাকবে না। গোড়ায় আধ ডজন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছিল এ রাজ্যে। এখন আছে তিনটি। এই তিনটি মিলে একটাই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গঠনের কথা ভাবা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নামে কোনও ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ড হয়ত ডুয়ার্সের কোথাও আর চোখে পড়বে না। এটা শুনতে খারাপ লাগলেও আসলে ভালই হবে। এটাই ভবিতব্য। তেমন দিন এলে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর নাম ছাপা পাসবইটার দিকে তাকাবেন আর ভাববেন, ওদের যতটা তাচ্ছিল্য করতাম, ততটা ওরা ছিল না।

সব সাফল্য কি লেখা যায়?

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

(প্রতিবেদক উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর সূচনা থেকেই ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু ব্যাঙ্কে তাঁর জনপ্রিয়তা এখনও একই রকম।)

ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগান হাঁটছে দিশাহীন আগামীর অস্পষ্ট পথে

কেন্দ্রীয় অধিগ্রহণের গেজেট বিজ্ঞপ্তি বাইরে থাকা চা-বাগান শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির এক কিস্তির টাকা মেটাল ডানকানস। অন্যদিকে, ওই বিজ্ঞপ্তির আওতায় থাকা আঠারো হাজার শ্রমিক পড়ে গেল ফাঁকে। নাগেশ্বরী, কিলকোটের নিভু নিভু প্রদীপের আলো উসকে উঠলেও মাদারিহাটের সাত বাগানের ভাগ্যে কী জুটবে তা নিয়ে এখন ডুয়ার্সের চা-বলয়ে জোর জল্পনা। আদালতের নির্দেশ একরকম অমান্য করে ডানকানসরা ডুয়ার্স চা-বাগান সমস্যার জটিলতা বাড়াল? নাকি সরকারকেই পরোক্ষে চাপে রাখল?

নতুন বোতলে পুরনো মদ

সাতটি চা-বাগান অধিগ্রহণ ইস্যুতে কলকাতা উচ্চ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি ওই বাগানগুলির শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করল ডানকানস। তারা কেন্দ্রের অধিগ্রহণের গেজেট বিজ্ঞপ্তির আওতায় থাকা সাতটি চা-বাগানের শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মেটাতে চার কোটি টাকা জমা করল না। বরং উলটে চাল খেলে দিল কর্তৃপক্ষ গোয়েঙ্কা। তারা অধিগ্রহণের বাইরে থাকা অন্য সাতটি চা-বাগানের শ্রমিকদের বকেয়ার এক কিস্তি মিটিয়ে সেই বাগানগুলি সচল করার একটা উদ্যোগ নিচ্ছে বলে সূত্রে খবর। এতে হয়ত অধিগ্রহণের আওতায় আনা বাগানগুলি খোলার ব্যাপারে চা-পর্ষদ তথা কেন্দ্রের উপরই চাপ খানিকটা বেড়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। কারণ ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল ওই টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এখন প্রশ্ন, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর কি কলকাতা উচ্চ আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ আর বহাল থাকবে? আইনজ্ঞদের মতামত থেকে অবশ্য স্পষ্ট হ্যাঁ বা না উত্তর মেলেনি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ মেনে ডানকানস উচ্চ আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছে। অন্য দিকে, নাগেশ্বরী, কিলকোট, বাগরাকোট, গঙ্গারাম, গোয়ালগছ, লক্ষ্মীপুর, পাটাগোরার মতো সাতটি বাগানে শ্রমিকদের ২০১৫-র এপ্রিল মাসের বকেয়া মজুরির ৬০ শতাংশ টাকা মিটিয়ে দেবার যে উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে তা খুবই অবাক করছে। একদিকে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা, অন্য দিকে অন্য সাত বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটানোর ইচ্ছে— এই দু'টি মিলিয়ে যে অঙ্ক তা কর্তৃপক্ষর সুকৌশলী চাল, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা

কিন্তু বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা তো সেই আতান্তরেই রয়ে গেল। কেন্দ্র কিংবা চা-পর্ষদ অথবা আদালতের বিচারকক্ষে যা-ই ঘটে চলুক না কেন, শ্রমিকদের তাতে কী এসে যায়? এখনও পর্যন্ত ঘটনা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে কি ডুয়ার্সের চা-বলয়ের কান্না থেমে যাবে? থেমে যাবে চা-শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল? অথচ কলকাতা উচ্চ আদালত যখন অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিল, তখন মনে মনে চা-পর্ষদ খুশিই হয়েছিল। চা-পর্ষদের খুশি হওয়ার কারণ কী? ডানকানস কর্তৃপক্ষকে একটু জব্দ করা গেল এই ভেবে? কিন্তু আদালত অন্য অ্যাকাউন্টে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জমা রাখার যে নির্দেশ দিয়েছে তা ডানকানসের পক্ষে মোটেও সন্তোষজনক নয়। তারা যে এ ক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে পারে— একথাও তো না ভাবার কোনও কারণ নেই। সব মিলিয়ে ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগান বিপন্ন। যদিও সে কথা আজ আর নতুন নয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে, ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে দীর্ঘ অচলাবস্থা টিকিয়ে রাখার পিছনে কি কোনও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা চলছে?

জেনে-বুঝেও ভাবা হয়নি

দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান যেমন পর্যটকের চোখে, তেমনভাবেই সাধারণ দৃষ্টিতেও অতি চমকপ্রদ লাগে। বিছিয়ে দেওয়া ওই সবুজ গালিচার সৌন্দর্য দেখে কতই না অনুভূতি খেলে যায় মনে। কিন্তু আজ ডুয়ার্সের বহু বাগানের সেই রং ফিকে হতে হতে মলিন হয়েছে। পরিচর্যাহীন চা-গাছগুলির থেকেও শীর্ণ চা-শ্রমিকদের চেহারা। অথচ ডুয়ার্সের অন্যতম বৃহৎ চা-শিল্পের সৌজন্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তহবিলে যুগযুগান্ত ধরে কোটি কোটি টাকা জমা পড়েছে। চা-শিল্প থেকে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পরিমাণও বেশ ভাল। চিন, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়ার সঙ্গে যুঝে বিদেশি বাজারে চা রপ্তানিও নেহাত কম কিছু নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে নানা কারণেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে ডুয়ার্সকে। তবে এ কথাও ঠিক যে, আন্তর্জাতিক বাজারে সেই চায়ের চাহিদাও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেনি। দার্জিলিং চায়ের কথা তো একেবারেই ভিন্ন। এত কিছুর পরও চা-শিল্পের সমস্যার কথা, দুর্দশার ছবি বহুদিন ধরেই লাগাতার উঠে আসছিল। তাহলে প্রশ্ন, কেন অনেক আগে থেকেই রুগ্‌ণ চা-বাগানের অবস্থা নিয়ে আমরা ভাবতে শুরু করিনি? কেন বন্ধ হওয়ার আগেই শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠিনি?

কল্পতরু হওয়ায় তো ক্ষতি নেই

অভিযোগ উঠেছে, অর্ধাহার-অনাহারে থাকা চা-শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু নিয়ে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগও উঠেছে বহু সময়েই। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা বাম-ডান কেউই কখনও বিনা চিকিৎসায় কিংবা না খেয়ে মরে যাওয়ার ঘটনাকে মানতে রাজি নয়। বরং বহু সময়েই অনাহার কিংবা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘিরে সরকার পক্ষের মন্তব্য হয়ে উঠেছে অমানবিক এবং অসামাজিক। কিন্তু বন্ধ ও অচল চা-বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যু যখন মিছিলে পরিণত হয়, সংবাদমাধ্যমে তা ঘন ঘন প্রকাশিত হয়, তখন তো তাদের একটু নড়েচড়ে বসতেই হয়। প্রশাসনের নড়েচড়ে ওঠাও জায়গা দখল করে সংবাদমাধ্যমগুলিতে। চুরি-ডাকাতি-খুন-রাহাজানি-ধর্ষণ থেকে শুরু করে এলাকা দখল, দাদাগিরি, এমনকি উঠতি তরুণ তুর্কির আচমকা বেড়ে ওঠা— এই সব ধরনের ঘটনা নিয়ে যখন নাগরিক মহল চিন্তিত হয়ে ওঠেন, আলাপ-আলোচনায় ঝড় তোলেন, প্রশাসনিক মহল বহু ক্ষেত্রেই তাতে নীরব থাকেন। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরাও এক সময়ে ওই

নাগেশ্বরীর উপর কেবলমাত্র ওই বাগানের চা-শ্রমিকরাই নয়, নির্ভরশীল লাগোয়া ইংডং, মেটেলি, সামসিং চা-বাগানের বহু বাসিন্দাও। কারণ, এইসব বাগানের শ্রমিকদের অস্থায়ীভাবে হলেও বহুকাল যাবৎ বছরভর কাজ মিলত নাগেশ্বরী চা-বাগান থেকে। সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার মানুষের রুটিরুজির একটা অর্থনৈতিক চক্র চলত। এতসব মানুষের কেনাকাটাতে রমরম করত মেটেলি বাজার।

ঘটনা মানতে বাধ্য হন। অথচ অনাহার কিংবা বিনা চিকিৎসায় শ্রমিকের মৃত্যু মেনে নেওয়া হয় না কোনওভাবেই। কিন্তু ডুয়ার্সের বন্ধ ও অচল চা-বাগানে অর্ধাহার, অনাহার এবং বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা তাতে থেমে যায়নি। রাজ্য সরকারের তরফে বন্ধ চা-বাগানে ২ টাকা কেজি চাল পরবর্তী সময়ে কল্পতরু হয়ে ৪৫ পয়সা কেজি দরে চাল দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। যেগুলি থেকে প্রশ্ন জাগে, যদি অর্ধাহার কিংবা অনাহারের ঘটনা না-ই ঘটে থাকে তাহলে এই ত্রাণের প্রয়োজন পড়ল কেন? অনেকেরই মত, বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছে বলেই এই তৎপরতা। মানতেই হবে, রাজনৈতিক দলের পক্ষে, বিশেষ করে শাসকদলের ক্ষেত্রে ভোট বড় বালাই। যদিও ভোট যত বড় কারণই হোক না কেন, বন্ধ চা-বাগান শ্রমিকরা যেখানে অর্ধাহারে-অনাহারে মরছে, সেখানে একবেলার হলেও দু'মুঠো অন্নের সংস্থান দেওয়াতে ক্ষতি তেমন হয় না। কিন্তু বন্ধ বা অচল বাগানের না খেতে পাওয়া শ্রমিকরা তো চান কাজ। বাগান খুললে, সচল চা-বাগানে কাজ করে খাটুনির টাকাই পেতে চান তাঁরা। সাহায্য-ভিক্ষা-অনুদান কিংবা লঙ্গরখানার খাদ্যে কতদিন আর পেট ভরানো সম্ভব?

দান-অনুদানে ভাঙছে স্থানীয় অর্থনীতি

প্রশাসন অর্ধাহার-অনাহার মানতে রাজি নয় বলেই অপুষ্টিজনিত কারণকে সামনে আনে। অপুষ্টি থেকেই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়েছে এমন সব ব্যাখ্যা দিয়ে স্বস্তি পায়। কিন্তু অপুষ্টির কারণ কী? দিনের পর দিন অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকা নয়? এভাবে আদৌ কোনও দোষ-ত্রুটি-গাফিলতিকে কি ঢাকা দেওয়া যায়? তা ছাড়া এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও কোনওভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা পায় না। কিন্তু সব থেকে পরিতাপের বিষয় এটাই ঘটে চলেছে। হয়ত এমনটাই শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পেয়ে সত্যি হয়ে উঠবে। অন্য দিকে, দানখয়রাতিকে ক্ষতিকর হিসেবে না মানতে পারলেও তা সমাজের অর্থনীতিতে যে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিসাধনই ঘটায়, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। প্রসঙ্গত, একটি অঞ্চলের সাম্প্রতিক ছবি তুলে ধরলে বিষয়টা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। ডানকানস গ্রুপেরই দু'টি বাগান নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা-বাগান রয়েছে মেটেলি এলাকায়। এই দু'টি চা-বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে এই এলাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু আজ সেই এলাকায় পরিস্থিতি যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে মেটেলি এলাকার কয়েকশো ব্যবসায়ী পড়েছেন মহা দুশ্চিন্তায়।

বন্ধ নয়, তবে অঘোষিত বন্‌ধ

২০১৫-র এপ্রিল মাস থেকে অচলাবস্থা চলছে মেটেলি বাজার গা-ঘেঁষা নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা-বাগানে। চার মাসের মজুরি বকেয়া থাকার পাশাপাশি নেই বাগানের দেওয়া রেশন। মাঝে দু'-তিন মাস কাঁচা পাতা তুলে অন্য বাগানে বিক্রি করে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২০১৫-র ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। এর পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখ নাগেশ্বরী চা-বাগানের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন বাগান কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি অদূর ভবিষ্যতে বদলাবে এমন আশা নিয়ে শ্রমিকদের একটি অংশ বিনা মজুরিতেই কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদিন আর পেটে কিল মেরে বিনা মজুরিতে কাজ চালানো যায়! ৬৫০ হেক্টরের নাগেশ্বরী চা-বাগানে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মোট শ্রমিকসংখ্যা দাঁড়ায় হাজার আড়াই। অন্য দিকে, ৩৮০ হেক্টর জমি জুড়ে যে কিলকোট চা-বাগান, সেখানেও যুক্ত রয়েছেন প্রায় দেড় হাজারের মতো শ্রমিক। খাতায়-কলমে দু'টি বাগানেই এখন অঘোষিত বন্‌ধের চেহারা।

ডুবতে বসেছে হাটবাজার

নাগেশ্বরীর উপর কেবলমাত্র ওই বাগানের চা-শ্রমিকরাই নয়, নির্ভরশীল লাগোয়া ইংডং, মেটেলি, সামসিং চা-বাগানের বহু বাসিন্দাও। কারণ, এইসব বাগানের শ্রমিকদের অস্থায়ীভাবে হলেও বহুকাল যাবৎ বছরভর কাজ মিলত নাগেশ্বরী চা-বাগান থেকে। সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার মানুষের রুটিরুজির একটা অর্থনৈতিক চক্র চলত। এতসব মানুষের কেনাকাটাতে রমরম করত মেটেলি বাজার। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, ওই বাজারের ব্যবসা নির্ভর করত এই দু'টি চা-বাগান আর তার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলির কেনাকাটায়। এখন ব্যাপারীদের কপালে হাত। ধারদেনার বিষয় তো আছেই, সেই সঙ্গে বেচাকেনাও প্রায় স্তব্ধ। বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, শুধু মেটেলি বাজার কিংবা রবিবারের হাট নয়, ডুয়ার্সের বহু এলাকায় এমন অনেক হাটবাজার রয়েছে, যেগুলির ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভরশীল ছিল চা-বাগান ঘিরে। বেশ কয়েক মাস যাবৎ যে বাগানগুলি অচল ও বন্ধ পড়ে রয়েছে, সেই এলাকার অর্থনীতি কীভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত— এটা বুঝতে অর্থশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব জানার দরকার পড়ে না। কিন্তু এক-একটি ছোট এলাকার অর্থনীতি কিংবা তার অবস্থা যদি ধীরে ধীরে এভাবে ভেঙে পড়ে, তার ধাক্কা লাগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপরও। একদিন ওই ছোট ছোট এলাকার অর্থনৈতিক ভাঙন গোটা সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে নড়িয়ে দেয়। তখন গোটা সমাজের অর্থনীতিটাই টলোমলো হয়ে ওঠে।

ডুয়ার্স এলাকার অর্থনীতিতে চা-শিল্পের এই মুমূর্ষু অবস্থা আজকের নয়। বাগানগুলির অচল অবস্থাও হঠাৎ করে একদিন এই অবস্থায় নেমে আসেনি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের তরফে উপেক্ষা-অবহেলা যেমন ছিল, তেমনই আছে। যদিও আজ ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা পরিণত হয়েছে খেলায়। সেই খেলার বলটি এখন এসে পড়ছে আদালতের বিচারকক্ষে। সেখানেও যে সুবিচার মিলবে, সে ব্যাপারে খোদ চা-শ্রমিকরাও আস্থা রাখেন না। এরকম অবস্থাই বলে দেয়, ডুয়ার্সের অচল ও বন্ধ চা-বাগান যেন ক্রমশই এগিয়ে চলেছে এক অস্পষ্ট আগামীর দিকে।

তপন মল্লিক চৌধুরী

দশিয়ারছড়া ছিটে স্বশাসন চলছে জেনেও ভারতীয় প্রশাসনের টনক নড়েনি

নির্বাচন কমিশনের মান্যতা না থাকলেও দশিয়ারছড়া ছিটমহলে চেয়ারম্যান পদের জন্য হয়েছে ছ'টি নির্বাচন। তাছাড়া একটি গ্রামে নিজস্ব সংবিধান মেনে আইন, আদালত ও রক্ষীবাহিনী তৈরি করে চলেছে স্বশাসন, যেখানে দিনের পর দিন মামলা মোকদ্দমা থেকে শুরু করে টাকার অঙ্কে জরিমানা এমনকি শারীরিক দণ্ড দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে ভারতীয় প্রশাসনের নিস্পৃহতায়। ভারতীয় ছিটমহলের বৃহত্তম ছিটের অজানা কাহিনি নিয়ে এবারের **একাদশ পর্ব**।

ছিটমহল হস্তান্তর পর্বে যে ছিটমহলটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল, তার নাম দাশিয়ারছড়া। ভারতীয় ছিটমহল তালিকায় তার পরিচিতি ১৫০ দাশিয়ার ছড়া। প্রায় সাড়ে ষোলো হাজার একর ভূখণ্ডের এই ছিটমহলটি ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার শুকারুর কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। সীমান্ত থেকে দাশিয়ারছড়ার দূরত্ব কোথাও দেড় কিলোমিটার, কোথাও দুই কিলোমিটার। প্রায় দশ হাজার জনসংখ্যার এই ছিটমহলটি দিনহাটা থানার সব থেকে বড় ছিটমহল। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি বাংলাদেশের কুঁড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার অভ্যন্তরে অবস্থিত। দাশিয়ারছড়া ছিটমহলের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই ছিটটির অভ্যন্তরে রয়েছে একটি বাংলাদেশি ছিটমহল। অর্থাৎ রাজওয়ারার মধ্যে মোগলান। মোগলানটির নাম চন্দ্রকোনা বা চন্দ্রঘান। বাংলাদেশি ছিটমহল তালিকায় এই ছিটটি বিনিময়যোগ্য নয় বলে চিহ্নিত। ছিটটির আয়তন প্রায় ৩৫ একর।

দাশিয়ারছড়া ও চন্দ্রকোনার সীমান্ত নির্ধারণ হয় বিগত শতকের তিনের দশকে। তা নিয়ে তৎকালীন ইংরেজ শাসিত বঙ্গ সরকারের রাজশাহি বিভাগের কমিশনার তথা কোচবিহার রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে কোচবিহার রাজদরবার অর্থাৎ রাজ্যের রিজেন্সি কাউন্সিলের বিস্তর চিঠি চালাচালি হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে কোচবিহার-রংপুর বাউন্ডারি কমিশন তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের সঙ্গে ইংরেজ শাসিত বাংলার উত্তর সীমান্তের রংপুর জেলার সীমানার কিছু অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়। সেই সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে তৎকালীন রংপুর জেলার ছিট এবং রংপুর জেলার অভ্যন্তরে কোচবিহার রাজ্যের ছিটগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়। ওই ছিটগুলি চিহ্নিত করার সময় তৎকালীন বঙ্গ সরকারের কমিশনার এসি হার্টলি ও কোচবিহার রাজ্যের কমিশনার এন সি মুস্তফি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। তাতে দাশিয়ারছড়া ও চন্দ্রকোনা ছিটের সীমানা সম্পর্কে তাঁরা একটি মন্তব্য করেছিলেন। এই রচনায় সেটি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। কোচবিহার-রংপুর বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে—

'Chhit Dasiar Chhara No. 150, Pargana Dinhata maps 36, 37, 39– This is large Chhit, containing a small Rangpur Chhit. The discrepancies are considerable in places... (b) In the small Chhit of Chandrakona J.L. No. 20, PS. Phulbari– This is no discrepancy of importance. The Chhit is demarcated by three pillars C.1. III.'

দাশিয়ারছড়া ছিটমহলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নীলকুমার নদী। কোনও কোনও জায়গায় এই নদী সীমানার কাজ করেছে। কোচবিহারের ছিট দাশিয়ারছড়া ও রংপুরের ছিট চন্দ্রকোনার সীমানা নির্ধারণের সময়ে প্রাচীন নীলকুমার নদীর গতিপথ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কোচবিহার-রংপুর বাউন্ডারি কমিশনের কাছে। সেটি অপ্রাসঙ্গিক না হলেও ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু এই আলোচনায় একটি প্রশ্ন এসেই যায়, দাশিয়ারছড়া নামকরণের উৎস কী? এ বিষয়ে সঠিক উত্তর আজও অধরা। ওই ছিটের বাসিন্দারাও এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য বা মতামত দিতে অপারগ। তবে এ বিষয়ে ইতিহাস অনুসন্ধান করলে সাবেগ ছিট বৃত্তান্তে দশির মহম্মদ নামে একজন জোতদারের নাম পাওয়া যায়। সাবেক রাজওয়ারা বালাপাড়া খাগড়াবাড়ির মধ্যে উপেনচোকী ভজনী নামক একখণ্ড মোগলানের জোতদার ছিলেন দশির মহম্মদ। তাঁর জোতদারি কত দূর বিস্তৃত কিংবা তিনি মোগল শাসকবর্গের কোনও উত্তরসূরি কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস অনেকটাই নীরব। তবে দশির মহম্মদের ছড়া থেকে দশিয়ারছড়া > দাশিয়ারছড়ায় পর্যবসতি কি না তা আরও অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

যা-ই হোক, কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার এই বৃহত্তম ভারতীয় ছিটমহলটির বাসিন্দারা উত্তর-স্বাধীনতাকালে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু বিভিন্ন কাজে দিনহাটায় আসার ক্ষেত্রে তাদের সেরকম কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না। উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে তাঁরা অবাধেই আসা-যাওয়া করতেন। দিনহাটা কিংবা সাহেবগঞ্জে তাঁরা জমি রেজিস্ট্রির কাজও সারতেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পরও তারা তাদের ছন্দেই চলতে থাকে। এর পর সাতের দশকের শেষ দিকে ছিটবাসীরা উদ্যোগী হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে। ইতিমধ্যে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ভূখণ্ডে পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্ব তাদেরকে যথেষ্টই উৎসাহিত করে তোলে। তবে তাদের এই ভাবনায় বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রভাবও যে একেবারে কাজ করেনি তা নয়। যে পদ্ধতিতে তাঁরা প্রশাসনিক বন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিলেন, তাতে ইসলামধর্মীয় প্রভাব যে অনেকাংশেই কাজ করেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। হয়ত বা বিষয়টি বাংলাদেশের তৎকালীন

দাশিয়ারছড়ার বিচারব্যবস্থা ছিলও বেশ অভিনব। শাসনব্যবস্থাও ছিল মজবুত। বিচারের জন্য ছিল আদালত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছিল ভিলেজ পার্টি। ভিলেজ পার্টিতে ছিল শতাধিক শক্তসমর্থ জোয়ান। ওদের কর্মশক্তি ছিল তারিফ করবার মতো। তির-ধনুক ছিল প্রধান অস্ত্র, তবে সাধারণভাবে ওরা লাঠিধারী। ওদের নিয়মিত ভাতাও প্রদান করত স্বশাসিত বোর্ড। ছিটমহলে কোনও বিবাদ হলে ভিলেজ পার্টি হস্তক্ষেপ করত।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুটা হলেও সম্পর্কযুক্ত। কিংবা বলা ভাল, প্রভাবিত।

দাশিয়ারছড়া ছিটমহলের মোট ১১টি মসজিদ সেখানকার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১১টি মসজিদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছিল নিজস্ব নির্বাচন কমিশন। সমগ্র দাশিয়ারছড়াকে তারা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে। অর্থাৎ তিনটি ওয়ার্ড তৈরি করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট নয়জন, পঞ্চায়েত এবং তিনটি ওয়ার্ডের নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে মোট ১১ সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েত বোর্ড গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। তবে এই পঞ্চায়েতি বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীতে কেবলমাত্র ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে পুরুষরাই স্থান পেয়েছিলেন। অর্থাৎ দাশিয়ারছড়ার স্বশাসিত প্রশাসনে মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে পুরুষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান-সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হতেন।

এই পদ্ধতিতে ১৯৮০ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ নির্দিষ্ট হয় ৫ বছর। অর্থাৎ প্রত্যেক ৫ বছর অন্তর নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দাশিয়ারছড়ার নিজস্ব নির্বাচন কমিশন। ১৯৮০ সালে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মহম্মদ নূরজামান। এর পর পর্যায়ক্রমে ১৯৮৫ সালে অর্থাৎ ৫ বছরের অন্তে নির্বাচনে মহঃ নূরজামান পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে তৃতীয় নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মহঃ আজগর আলি। এর পর ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে অর্থাৎ চতুর্থ নির্বাচনে মহঃ আকছার আলি এবং ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম নির্বাচনে নজরুল ইসলাম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০০5 সাল পর্যন্ত নজরুল ইসলাম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলালেও ওই বছর থেকেই স্বশাসিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ছেদ পড়ে। অর্থাৎ দাশিয়ারছড়ায় ষষ্ঠ দফার নির্বাচন শেষ পর্যন্ত আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ষষ্ঠ দফার নির্বাচন না হবার পিছনে রয়েছে এক উপন্যাসসম পালাগান।

এবার আসা যাক সীমান্ত থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রমাণ সাইজের ওই গ্রামের স্বশাসনের কথায়। কেমন ছিল সেই স্বশাসনের স্বরূপ? সেখানকার প্রবীণ বাসিন্দা মহম্মদ খলিলুদ্দিনের ভাষায়, দাশিয়ারছড়া ছিটমহলের যেমন নিজস্ব নির্বাচন কমিশন ছিল, সেরকম ছিল সংবিধান। আইনকানুন, নিজস্ব আদালত, রক্ষীবাহিনীও ছিল। তবে ছিল না কোনও রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ ও ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার ককটেলে দাশিয়ারছড়ার নির্বাচন হত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিজস্ব নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া, পোলিং বুথ, পোলিং পার্টি, সুস্থ ভোটগ্রহণের স্বার্থে রক্ষীবাহিনী— সবই ছিল দাশিয়ারছড়ায়। যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, তারা পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি ছাপানো থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচার, সভা— সবই করত। তবে নির্বাচনের সমস্ত খরচ প্রার্থীদের বহন করতে হত। প্রত্যেক ওয়ার্ডে বা ব্লকে তিনজন মেম্বারকে নির্বাচিত করার পাশাপাশি আমেরিকার ধাঁচে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হত।

যদিও ভারতীয় ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত এই দাশিয়ারছড়ার নির্বাচনে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের কোনও মান্যতা ছিল না। তবে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে তাঁরা নিয়ম করে পাঁচ বছর পরপর এই ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। তবে তাঁদের নিজস্ব নির্বাচন কমিশন সমস্ত বিষয়টি দিনহাটার মহকুমা প্রশাসন ও সীমান্ত প্রহরায় সদাসতর্ক বিএসএফ-কে ওয়াকিবহাল করতেন। মহকুমা প্রশাসনও এই ব্যবস্থাকে অনেকটাই মেনে নিয়েছিল। সীমান্তরক্ষীবাহিনী নির্বাচিত বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রকে মান্যতা দিয়ে তাঁদের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে দিতেন। তবে ছিটবাসীরাও এই সুযোগের অপব্যবহার কম করেননি তা বলাই বাহুল্য।

দাশিয়ারছড়ার বিচারব্যবস্থা ছিলও বেশ অভিনব। শাসনব্যবস্থাও ছিল মজবুত। বিচারের জন্য ছিল আদালত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছিল ভিলেজ পার্টি। ভিলেজ পার্টিতে ছিল শতাধিক শক্তসমর্থ জোয়ান। ওদের কর্মশক্তি ছিল তারিফ করবার মতো। তির-ধনুক ছিল প্রধান অস্ত্র, তবে সাধারণভাবে ওরা লাঠিধারী। ওদের নিয়মিত ভাতাও প্রদান করত স্বশাসিত বোর্ড। ছিটমহলে কোনও বিবাদ হলে ভিলেজ পার্টি হস্তক্ষেপ করত। বিবাদ মীমাংসার জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ড বা ব্লকের পঞ্চায়েত বা সদস্যর মাধ্যমে সালিশি সভা বসত। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হত। তবে সালিশি সভার বিচার মনঃপূত না হলে আদালতের দ্বারস্থ হবার সুযোগ থাকত। তবে এ ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ফি বোর্ডের কাছে জমা দিয়ে মামলা করবার সুযোগ মিলত। যত দূর জানা যায়, সর্বশেষ ফি ছিল ১৩৫ টাকার মতো।

মামলা দায়ের হবার পর আদালতের পক্ষ থেকে সমন পৌঁছাত বাদী ও বিবাদীর কাছে। এর পর নির্দিষ্ট দিনে উভয় পক্ষকে ২৫ টাকা আদালতে জমা দিয়ে হাজিরা দিতে হত। এইভাবেই শুরু হত মামলার বিচারপর্ব। সওয়াল-জবাবের সময় অন্যেরা অংশ নিতে পারলেও, কোনও পক্ষ যদি ছিটমহলের বাসিন্দা ব্যতিরেকে বাংলাদেশি কোনও ব্যক্তিকে সেখানে হাজির করত, তবে তার মাশুল তাকে গুনতে হত। আদালতের রায়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে অর্থদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড দেবার বিধান দাশিয়ারছড়ার নিজস্ব সংবিধানে ছিল। মহঃ খলিলুদ্দিনের ভাষায়— ১৯৮৫ সালে দাশিয়ারছড়ায় একটি খুনের ঘটনা ঘটে। আদালতের বিচারে আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা ও রক্ষীবাহিনীর প্রহারে ছিটমহল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তবে দাশিয়ারছড়ায় অপরাধ বলতে বড় ধরনের কিছু সাধারণত ঘটে না। যতটুকু ঘটে তা ভিলেজ পার্টি সামলে দেয়। ভারতীয় প্রশাসনের নিস্পৃহতা ওদেরকে স্বশাসনে বাধ্য করলেও ওরা নিয়ম করে প্রতি বছর ১৫ অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে দিনটি উদ্‌যাপন করতে ভোলে না।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' চাইছেন?

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার শহরে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেক্ষেত্রে যিনি আপনাকে পত্রিকা পৌঁছে দেবেন তাঁর হাতে পত্রিকার দাম দিয়ে দিতে হবে, নতুবা পরের সংখ্যাটি পৌঁছনো সম্ভব হবে না। এককালীন ২৫০ টাকা পাঠিয়েও এক বছরের সবকটি সংখ্যা বাড়িতে বসে পেতে পারেন। A/C Payee Cheque 'Ekhonduars' নামে কিংবা ক্যাশেও টাকা পাঠানো যায়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন দেবজ্যোতিকে ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

হাতুড়ে ডাক্তারখানায় ছয়লাপ শিলিগুড়ি

বিদ্যের দৌড় কারও ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, কেউ কেউ স্কুল টপকানোর দোরগোড়াতেই হোঁচট খেয়েছে। অথচ তারাই নাকি ডাক্তার অমুক চন্দ্র তমুক নামের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রোগী দেখছে। ভিজিট নিচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নয়, শিলিগুড়ির মতো শহরের আনাচকানাচে। অভিযোগ সাধারণ মানুষের নয়। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর রাজ্য শাখার। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ভয়ংকর অভিযোগটি জনসমক্ষে এনেছেন আইএমএ-র রাজ্য শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি, শিলিগুড়ি শহরেরই

চিকিৎসক পীযূষ রায়। নাম ভাঁড়িয়ে ভুয়ো ডিগ্রি লিখে চিকিৎসার নামে উপার্জন করছে— এমন খবর মাঝেমধ্যে পাওয়া যে যায় না তা নয়। কিন্তু তার অধিকাংশই ঘটে থাকে অজ গাঁয়ে। একেবারে শহরের বুকে একাধিক জন এমন প্রতারণা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে বলেই প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ি শহরেই তো রয়েছে আইএমএ-র শক্তিশালী শাখা। তাঁরা জেনে-বুঝেও কেন এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন? এতদিন কেন তাঁরা ভুয়ো ডাক্তারদের ধরেননি! প্রশাসনকে বাধ্য করেননি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে? শুরুতেই যদি ব্যবস্থা নেওয়া যেত তাহলে চিকিৎসার নামে ভুয়ো ব্যবসা এত প্রসারিত হত না। আইএমএ-র রাজ্য সভাপতির মত, পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে নাকি কিছু হবে না। তাহলে কাকে কোথায় জানালে কাজ হবে? রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর নতুন নির্দেশিকা জারি না করলে নাকি এসব বন্ধ হবে না। এতদিন তাহলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সে কাজে বাধ্য করা হল না কেন? কেন এতদিন ভুয়ো ডাক্তারদের একটি তালিকা তৈরি হল না কিংবা যেসব জায়গায় পয়সা দিয়ে ভুয়ো ডিগ্রি কিনতে পাওয়া যায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল না? ভুয়ো ডাক্তারদের চিকিৎসায় ইতিমধ্যে তো বেশ কিছু রোগী জটিল সমস্যার কবলে পড়ে গিয়েছেন। তাঁদের প্রাণান্তকর অবস্থার জন্য আইএমএ-কে কি অনেকটা দায়ী করা যায় না? ভুয়ো ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগীদের জীবনের ঝুঁকি যে অনেকটাই বেড়ে গেল, তার দায় নেবেন কারা? হাতুড়ে ডাক্তারদেরই যেখানে রাজ্য সরকার কাজে লাগাতে চাইছেন, সেখানে কোয়াক ট্রিটমেন্টই তো হয়ত একদিন এ রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে বীরভূমে ১২০০ হাতুড়ে চিকিৎসক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অন্য জেলাগুলিতেও শুরু হতে চলেছে। তাহলে আর আইএমএ-র উপর মিছে রাগ কেন? তা ছাড়া আইএমএ-র নতুন সভাপতিও তো হাতুড়ে চিকিৎসকদের স্বীকৃতি না দেওয়ার কথা মোটেও বলছেন না।

বোরো ধান চাষে মার খেতে পারে কোচবিহার

কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। প্রবাদ হলেও অনেক সময়ই তেমনটা ঘটে যায়। কোচবিহার জেলার আলু-ধান-পাট চাষি সংগ্রাম সমিতি আসন্ন বোরো ধান চাষের ফলন নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তা থেকেই ওই প্রবাদটি মনে এল। জেলা কৃষি দপ্তর থেকেই জানা যাচ্ছে, ফি-বছর কোচবিহারে ২৮,৫০০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়। ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মূলত বোরো ধানের চারা লাগানোর কাজ চলে জমিতে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই সে কাজ প্রায় পুরোটাই সারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জেলার সার ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারা এবং আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সরব হয়েছেন— ডিসেম্বর মাস থেকে বা তার আগে থেকে জেলার হাটে দেদার বিকানো কম দামের বোরো ধানের বীজ নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ, কম দামি ওই বীজ বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে কোচবিহার জেলার হাটেবাজারে ঢুকেছে। অপেক্ষাকৃত কম দাম, তাই জেলার দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা ও কোচবিহার সদরের বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে ওই বীজ দেদার বিকিয়েছে। খোলা বাজারে বোরো ধানের উন্নত বীজ যেখানে বিক্রি হয় ২২৫-২৫০ টাকা কেজি দরে, সেখানে চোরা পথে আসা ওই বীজ বিক্রি হয়েছে ১৫০ টাকা কেজি দামে। কম দামের লোভনীয় ফাঁদে পড়ে জেলার বহু চাষিই ওই কম দামি বীজ কিনে বপন করেছেন তাঁদের জমিতে। শুধু তা-ই নয়, চোরাকারবারিরা চাষিদের থেকে অগ্রিম দাম নিয়েও কৃষকের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওই বীজ। একদিকে বাজারের থেকে দাম কম, অন্য দিকে হাট থেকে নিয়ে আসার হ্যাপা— চাষিরা প্রস্তাব লুফে নিয়েছেন। কিন্তু সেই কম দামের বীজ থেকে আশানুরূপ ফলন মিলবে কি? এক তো বীজ বেচাকেনা শেষ, তার উপর সেই বীজ বপনের পর চারা লাগানোর কাজও প্রায় যখন সারা হয়ে গিয়েছে, তখন টনক নড়েছে। এর উপর জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে পাওয়া খবর জানাচ্ছে, গত বছর সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের চাষিরা বাংলাদেশের বোরো ধানের বীজ লাগিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফলন পায়নি। তা ছাড়া চোরা পথে বাংলাদেশ থেকে ঢোকা ওই বোরো ধানের বীজ কৃষিবিজ্ঞানী অথবা সে দেশের কৃষি দপ্তর দ্বারা আদৌ স্বীকৃত কি না, সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। ফলে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে এ মরশুমের বোরো ধান চাষের ফলন নিয়ে। এদিকে চাষি সংগ্রাম কমিটি, সার ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সমিতির অভিযোগে জেলা কৃষি দপ্তর যখন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যাশ মেমো-সহ সার্টিফায়েড বীজ কেনার জন্য সচেতনতা বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে, তখন সময় পার হয়ে গিয়েছে অনেকটাই।

মাংসাশী মাছি উড়ছে ডুয়ার্স জঙ্গলে

ডুয়ার্সের মৃত হাতির শরীরে বটফ্লাই মাছির লার্ভা দেখে চক্ষু চড়কগাছ চিকিৎসকের। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার ডায়নার টুন্ডুর জঙ্গলে একটি হাতির মৃত্যু হয়। হাতিটি তার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই অসুস্থ ছিল বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। তার আচরণে কয়েকদিন ধরেই অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যাচ্ছিল বলে জানান বনকর্মীরা। তাঁদের কথামতো হাতিটি প্রায় সপ্তাহ দুয়েক ধরে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

খাবার সামনে রাখা হলে হাতিটি খাওয়ার চেষ্টাও করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেতে পারছিল না। এরকম অবস্থার পরও কিন্তু হাতিটিকে ধরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। অবশেষে হাতিটির মৃত্যু হয়। ওই দিনই মৃত হাতির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয় ডুয়ার্সের পানাঝোরার জঙ্গলে। পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলা শুরু হয় ময়নাতদন্ত। কিন্তু মৃত হাতির দেহ ব্যবচ্ছেদের পরই চমকে ওঠেন চিকিৎসক। তিনি লক্ষ করেন, মৃত হাতির খাদ্যনালি থেকে প্রায় গোটা শরীরে বাসা বেঁধেছে কয়েক হাজার বটফ্লাই মাছির লার্ভা। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বটফ্লাই হল ভয়ংকর প্রজাতির মাংসাশী মাছি। মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো, মোজাম্বিক, ঘানা এবং এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারে এদের দেখা মেলে। এ দেশেও ওই মাছির অস্তিত্ব আছে বলে মনে করছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী। বটফ্লাই সরাসরি অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না বা তাদের শরীরে বসে না। এরা অন্য যেসব মাছি আছে, তাদের শরীরের উপর বসে এবং ডিম পাড়ে। ওই সাধারণ মাছিরাই আবার যখন বন্য প্রাণীর শরীরে বসে এবং ডিম পাড়ে, সেখান থেকেই বন্য প্রাণীর শরীরে বটফ্লাই মাছির লার্ভা ছড়াতে থাকে। ওই লার্ভাই বন্য প্রাণীর শরীর কুরে কুরে খায় এবং একদিন শরীর ছেড়ে মাটিতে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় 'মায়াসি'। ওই হাতিটির দেহে যে বটফ্লাই বা মাংসাশী মাছির লার্ভা মিলেছে, সেটি হল ইন্টেস্টাইনাল প্রজাতির। সেই কারণে হাতিটির খাদ্যনালি থেকে শুরু করে শরীরের অন্যান্য অংশ তারা খেতে শুরু করেছিল। যে কারণে হাতিটি খাদ্য গ্রহণ করতে পারছিল না। দীর্ঘদিন খাদ্যাভাবে থাকতে থাকতে হাতিটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত হাতিটির শরীরের লার্ভা পরীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এবং জলপাইগুড়ি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। যদিও এর আগেও জলপাইগুড়ির ধূপঝোরার কুনকি হাতি রাজার দাঁতে এই প্রজাতির মাছির উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। তবে সেবার প্রাথমিক অবস্থাতেই সেটি ধরা পড়ায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসার কারণে রাজা সেরে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে হাতিটির অসুস্থতা লক্ষ করেও তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ ভাবেননি, ফলে বিনা চিকিৎসায় হাতিটি তিল তিল করে মরেছে। এখন প্রশ্ন, ডুয়ার্সের জঙ্গলেও কি তবে বটফ্লাই বা মাংসাশী মাছিরা উড়ছে? এর উত্তর তো দিতে পারে একমাত্র বন দপ্তর। তার জন্য কি কোনও অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন? নাকি আরও কয়েকটি প্রাণীর মৃত্যু এবং বটফ্লাইদের বংশবৃদ্ধি ও ডুয়ার্সের জঙ্গল বটফ্লাইতে ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই অনুসন্ধান সম্ভব নয়!

শতবর্ষে পা রেখেও জেলা গ্রন্থাগারের মর্যাদা পেল না এডওয়ার্ড লাইব্রেরি

মহাভারতের পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে শতবর্ষের পুরনো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথি, পত্রপত্রিকার সম্ভার মিলিয়ে আলিপুরদুয়ার সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। উপনিবেশ আমলে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে বখরিবাড়ি এলাকায় শুরু করেছিলেন এই গ্রন্থাগারটি। তারপর থেকে বহুবার গ্রন্থাগারটির স্থানবদল ঘটেছে। কখনও কালজানির সেতুর কাছে, পরে জলপাইগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে। তারপর ম্যাকউইলিয়াম ইনস্টিটিউট হলে এবং সবশেষে মিলন সংঘ এলাকায় স্থানান্তরিত হয় এখনকার গ্রন্থাগার ভবনটি। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারটির মর্যাদার ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছে বহুবার। ১৯৫৯ সালে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরি পেয়েছিল গ্রামীণ লাইব্রেরির মর্যাদা। এর পর ১৯৭৫ সালে সেই মর্যাদা বদলে হয় মহকুমা। এর পর ১৯৯৮ সালে জোটে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের মর্যাদা। বহু পণ্ডিত, মনীষীর পদধূলি পড়েছে এই গ্রন্থাগারটিতে। উল্লেখ করা যায়, ১৯৫১ সালে নীহাররঞ্জন রায় এই গ্রন্থাগার ঘুরে দেখে জানিয়েছিলেন, এমন সুন্দর লাইব্রেরি তিনি খুব একটা দেখেননি। চলতি বছরে গ্রন্থাগারটি শতবর্ষে পদার্পণ করল। গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রন্থাগার কমিটির উদ্যোগে শুরু হয়েছে শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, শতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগারটির গা থেকে অতিরিক্ত জেলা কথাটিকে এখনও সরানো গেল না কেন? পৃথক জেলা হিসাবে আলিপুরদুয়ারের বয়স প্রায় দু'বছর হতে চলেছে, তা সত্ত্বেও এমনটা হল কেন? এক তো ৫০ বছর আগে তৈরি ভবনটির বর্তমান অবস্থা মোটেও ভাল নয়। বলা যায়, বইয়ের ভার ভবনিটি একেবারেই বইতে অক্ষম। ৩২ হাজার বই একটি জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষে অনেকটাই মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু সেই সম্পদকে সুস্থ ও সাবলীলভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে দরকার পড়ে উপযুক্ত পরিকাঠামোর। যেখানেও অভাব প্রকট। প্রাচীন এবং নতুন বইয়ের সংরক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। সেগুলিকে যথাযথভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও দরকার হয় উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং লোকবল। অনিয়ম রয়েছে সেখানেও। খাতায়-কলমে বইয়ের সংখ্যা যেমন প্রচুর, পাঠকের সংখ্যাও প্রায় আড়াই হাজার। কিন্তু সেগুলি লোকবল এবং অর্থাভাবে যথাযথভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছে না। প্রাক্তন সভাপতি অর্ণব সেন এবং বর্তমান পরিচালন কমিটির সভাপতি কনজবল্লভ গোস্বামী এবং রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য দিলীপ রায় জানালেন, সময়ের সঙ্গে গ্রন্থাগারটির গুরুত্ব বেড়েছে, কিন্তু কর্মী মাত্র তিনজন। শুধু কর্মীসংখ্যা বাড়ালেই তো হবে না, দরকার নতুন ভবনেরও। পাঠকরা নানা বিষয়ের বিভিন্ন বই দাবি করছেন, কিন্তু এই ভবনে বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। আর জেলা গ্রন্থাগার না হওয়া পর্যন্ত নতুন ভবন তৈরির যেমন সমস্যা রয়েছে, তেমনই অন্যান্য সরকারি সহায়তাও মিলবে না।

রক্ত পরীক্ষার নতুন যন্ত্রে অপচয় কমবে, রোগী বাঁচবে

এক ইউনিট রক্ত দিয়ে একজন নয়, দু'জন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য দরকার হয় হোল ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেট ইউনিট। বিষয়টা এমন কিছু দুরূহ নয় যে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে জানা-বোঝা যাবে না। প্রসঙ্গত বলতে হয়, রক্তে ব্লাড সেল এবং প্লাজমা থাকে। রোগ অনুযায়ী এক-একজন রোগীর এক-একরকম জিনিসের দরকার

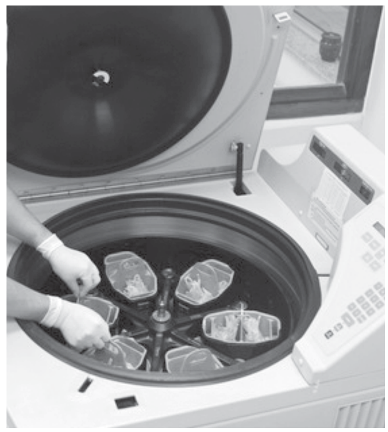

পড়ে। যেমন যে মানুষ আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন, তার প্রয়োজন হয় ব্লাড প্লাজমা। অন্য দিকে যে রক্তাল্পতায় ভুগছে, তার চিকিৎসার জন্য দরকার হয় ব্লাড সেল। কিন্তু হোল ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেট ইউনিট চিকিৎসাকেন্দ্রে না থাকলে রক্তের ব্যাগ নিয়ে পুরোটাই দিয়ে দিতে হয় রোগীকে। রোগীর দেহে ব্লাড সেলের দরকার না থাকলেও তাকে তা নিতে হবে। আবার যার প্লাজমার কোনও প্রয়োজন নেই চিকিৎসা চলাকালীন, তাকেও গ্রহণ করতে হবে প্লাজমা। এর ফলে অপচয় হয় রক্তের। রোগীর দরকারের সময় কখনও

আবার রক্ত মেলে না। কিন্তু হোল ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেটে ইউনিট থাকলে রক্তের অপচয় এড়ানো যায় যেমন, তেমনই রোগীর প্লাজমা প্রয়োজন কিংবা যার ব্লাড সেল দরকার, তাকে সেটিই দেওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই ব্যবস্থা আগেই চালু হয়েছিল। কোচবিহার জেলা হাসপাতালেও ওই ইউনিট সম্প্রতি মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা চেয়ে পাঠিয়েছে। পূর্ত দপ্তর ওই পরিকল্পনা তৈরির কাজও প্রায় সেরে ফেলেছে বলে জানা গেল কোচবিহার জেলা হাসপাতালের সুপার জয়দেব বর্মনের কাছ থেকে। তিনি আরও জানান, ওই ব্যবস্থা চালু হলে প্রযুক্তির সাহায্যে প্লাজমা ও ব্লাড সেল পৃথক করা সম্ভব হবে। ফলে এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে বাঁচানো যাবে অন্তত দু'জন রোগীকে। ইতিমধ্যে সামান্য রক্তের অভাবে কত মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ গিয়েছে, অপচয়ও হয়েছে বহু ব্যাগ রক্ত। গত বছরই এই সুবিধা চালুর জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। সবকিছু খতিয়ে দেখে তা মঞ্জুর করতে স্বাস্থ্য দপ্তরও খুব দেরি করেনি। কোচবিহার রোগী কল্যাণ সমিতিও জানাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ওই ব্যবস্থা চালু হবে।

হতেই পারে

দার্জিলিঙে বিমল গুরুঙের দিন ফুরাল বলে। হরকাবাগানের ধাক্কা শুরু হয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সবাসী এখন অপেক্ষা করছে কবে বিমলকে পাহাড় থেকে সমতলে তাড়িয়ে দেবেন হরকা বাহাদুর। অতীতে সুবাস ঘিসিং যেমন রাজপাট হারিয়ে দার্জিলিংছাড়া হয়ে জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ি ভাড়া করে কাটিয়েছিলেন, তেমনটা বিমলের ক্ষেত্রেও হবে বলে নিশ্চিত ডুয়ার্সবাসী। ব্যাপারস্যাপার সেদিকেই নাকি এগচ্ছে। এখন শুধু দেখবার যে, বিমল গুরুং ভবিষ্যতে কোথায় বাড়ি ভাড়া করেন। আরও ভবিষ্যতে হরকাকেও আসতে হবে। এটাই নিয়তি। তারপর সুদূর ভবিষ্যতে একদিন একটা নতুন পাড়া গড়ে উঠতে পারে ডুয়ার্সে, যেখানে সবাই প্রাক্তন গোর্খাল্যান্ড নেতা!

বিজ্ঞরা শুনে বলছেন, পসিবিলিটি হাই।

আসিতেছে আসিতেছে

শোণিতে শর্করাধিক্যের কারণে 'রসগোল্লা টক' ভেবে যাঁরা অনিচ্ছেতেও মিষ্টির দোকান এড়িয়ে চলেন কিংবা সরেস সন্দেশ দেখে চরম বৈরাগ্যের শিকার হন, তাঁদের সংখ্যা তো ডুয়ার্সে কম নয়। কিন্তু উপায়ই বা কী? ডায়াবেটিসে ভোগা মিষ্টান্নপ্রিয়দের জন্য শর্করাহীন মিষ্টি প্রায় মেলেই না ডুয়ার্সে। অবশ্য সেই দুঃখের দিন ফুরাতে চলেছে। রাজ্যের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি তাঁদের সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, খুব তাড়াতাড়ি ডুয়ার্সের কোণে কোণে পাওয়া যাবে সেই মিষ্টি, যা ইচ্ছে হলেই টপ করে মুখে ভরে দিতে পারবেন মধুমেহাক্রান্ত ক্রেতা। স্রেফ ক'টা দিন সবুর করতে হবে শুধু। শুনে মিষ্টবঞ্চিত জনৈক শর্করারোগী মন্তব্য করলেন, 'শুগার-ফ্রি মিষ্টি আর বউ-ফ্রি হানিমুন এক জিনিস।'

এ আসলে অভিমানের কথা। আসিতেছে যখন, আসিলে কি খাইব না?

যান আর জান

জাতীয় বা রাজ্য সড়ক থেকে ভিতরে থাকা জনপদগুলিতে আম জনতার যাওয়া-আসার জন্য রাস্তাঘাট থাকলেও গণবাহনের সংখ্যা বড়ই

সীমিত। সেসব রুটে বাস চলে হাতে গোনা অথবা চলেই না। টোটো আর কদ্দুর ছুটতে পারে! তাই ভরসা অটো, ছোট গাড়ি কিংবা ভ্যান। এসব গাড়িতে বাদুড়কে লজ্জা দিয়ে ডুয়ার্সবাসী যেভাবে যাতায়াত করে তা দেখলে বিমা কোম্পানিগুলো নির্ঘাত লসের ভয়ে ব্যবসা গুটিয়ে চম্পট দেবে! দুর্ঘটনা তো ঘটেই। তা সত্ত্বেও গাড়ি বাড়ে না কেন? গাড়িওয়ালা বলে, প্যাসেঞ্জার হয় না, আর প্যাসেঞ্জাররা বলে, গাড়িতে জায়গা হয় না। সত্যিই এক গোলমেলে প্রহেলিকা বটে! জান হাতে নিয়ে যানে চেপে যাওয়ার এমনই একটা ছবি সঙ্গে। ওদলাবাড়ির কয়েক কিলোমিটার দূরে।

শ্যামা বোষ্টুমি

জল্পেশের চৈত্র মেলা এল বলে। এটাই ছিল জল্পেশের আদত মেলা, যার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবনের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। এখন সে দিন নেই, কিন্তু মেলা বসে। লোক আসে দেদার। যদি জল্পেশে যান এই সময়, তবে পেয়ে যাবেন শ্যামা বোষ্টুমিকে। মন্দির লাগোয়া গড়তলি জল্পেশ গ্রামেই জন্ম তাঁর। মন্দিরকেই সংসার বানিয়ে নিয়েছেন। শিবকে পতি মেনে কাটিয়ে দিচ্ছেন জীবনের বরাদ্দ দিনগুলি। চাহিদা বলতে কিছুই নেই। দেখা হলে মিষ্টি হাসবেন তিনি। ছবিতে যেমন।

ওরে বাবা!

শিলিগুড়িতে নাকি এইট পাশ ডাক্তারদের রমরমা পসার। স্যুট-বুট পরে সাহেব সেজে অনেক ওষুধের দোকানেই নাকি ননমেট্রিক এমবিবিএসের দল চুটিয়ে রোগী দেখছে। হাতুড়ে রীতিতে ভুতুড়ে ওষুধ দিয়ে রোগীর পরলোকের পাসপোর্ট বানাতেও নাকি এদের জুড়ি নেই। কখনও কখনও শ্লীলতাহানি ঘটিয়ে ফেলছে মহিলা রোগীদের! ডুয়ার্সের আম আদমি তো উন্নত চিকিৎসকের জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ম করে ভিড় জমায়। এদের একটা অংশ সটান পড়ছে এইসব আশ্চর্য ডাক্তারের কবলে। না না! এসব আমাদের কথা নয়কো! ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি এ নিয়ে অভিযোগ তুলে আমাদের চুল খাড়া করে দিয়েছেন সম্প্রতি! মাধ্যমিক ফেল হয়েছেন তো কী হয়েছে! টাকা দিলেই বিহার থেকে চলে আসবে আপনার বদ্যিগিরির ছাড়পত্র।

বাব্বা! শুনেই তো হার্টফেল করতে ইচ্ছে করছে!

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

ডুয়ার্সে ১৯৬৮ সালের বন্যায় গবাদি পশুদের মৃতদেহ স্তূপ সরাতে এগিয়ে আসে তথাকথিত সমাজ বিরোধী বলে পরিচিতরাই। ওই কাজে তাদের জোগান দিতে হত মদ। থানা থেকে মদের স্লিপ ইস্যু করা হত। দোকানে স্লিপ দেখালেই মিলত বাংলা মদ। তখন বাংলা মদের সেভেনটি-এইট্টির ফারাক এক তরুণের কাছে ছিল সত্যিই এক অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি বন্যার ত্রাণবাবদ টাকা দু'বার হাতে পেয়েও হতদরিদ্র মানুষ যে ফিরিয়ে দিতে পারে তাও নিছক অভিজ্ঞতা নয়, জীবনের এক শিক্ষণীয় অধ্যায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্বেও জীবন ধারাভাষ্যে সেইসব পুরনো কাহিনি নতুন মাত্রা নিয়ে আসে।

দেবপ্রসাদ রায়

৫

১৯৬৮-র ওই বন্যা আদতে ছিল এক প্রলয়। বন্যার পর প্রথম দশ দিন না ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ, না পানীয় জল, না প্রশাসন। জেলাশাসক ছিলেন কোনও এক মল্লিকমশাই। তিনি বন্যার পর চলে গেলেন তো চলেই গেলেন! এডিএম ছিলেন এসবি মজুমদার। তিনিই যেটুকু সামলানোর সামলাচ্ছিলেন। শহরে ১৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন শ্রীরাম সিং। যখন ত্রাণের ব্যবস্থা শুরু হল, তখন তিনি আমাকে দায়িত্ব দিলেন। শহরে সে সময় মহামারি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বন্যার ধ্বংসলীলা ছিল মারাত্মক, তবে সেই অনুপাতে মানুষের মৃত্যু না হলেও অগণিত গোরু-মোষ-ছাগল-কুকুর ইত্যাদি মরেছিল। সেসব মৃতদেহ পচে গিয়ে মহামারির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছিল প্রতিদিন। সেসব আশু পরিষ্কার করে ফেলার দরকার হল। কিন্তু সেসব সরাবে কে?

এই সময় দেখেছিলাম, জলপাইগুড়ি শহরে যারা তথাকথিত বাজে ছেলে বা সমাজবিরোধী নামে পরিচিত ছিল, তারাই সবার আগে এগিয়ে এল। তবে, রাশি রাশি এবং পচন-ধরা লাশ সরাতে গিয়ে তাদের নেশার দরকার হয়ে পড়ল, আর নেশার খরচ জোগানোর দায়িত্ব নিল প্রশাসন নিজেই। আমি নেশা না করার কারণে সেই কাজে সরাসরি জড়িয়ে যেতে পারছিলাম না বলে পাড়ার লোকজন আমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিল। সেটা ছিল থানা থেকে স্লিপ নিয়ে দিনবাজারের ভাটিখানা থেকে স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য মদ নিয়ে আসা। বলতে বাধা নেই যে, সেই দায়িত্ব আমি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করতাম।

একটা মজার ঘটনাও ঘটল সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। থানার ওসি'র কাছে মদের বোতলের জন্য স্লিপ আনতে গিয়েছি। ওসি পনেরোটার বেশি দিতে চাইছেন না। আমিও 'লোক বেশি আছে। লাগবে' ইত্যাদি বলে কুড়িটা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছি। শেষে ওসি কুড়িটার স্লিপই দিলেন। আমি বিজয়ীর গর্বে কুড়িটা বাংলার বোতল এনে স্বেচ্ছাসেবীর হাতে দিয়ে তাদের প্রশংসা শোনার আশায় যখন তাকিয়ে আছি, তখন প্রশংসার বদলে তারা আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'এসব কী এনেছিস? এর বদলে কুড়িটা জলের বোতল আনলেই তো পারতিস!'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'কেন?'

'ওরে! এগুলো সব এইট্টি!'

আসলে ফিফটি, সেভেন্টি, এইট্টির হিসেবটা আমার অজানা থাকায় এই বিপত্তি।

এর পর থেকে শহরে যেটা শুরু হল, তা হল লুটপাট। এফসিআই-এর গুদাম, দিনবাজার, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, সমবায়-এর গুদাম অবাধে লুট হয়ে গেল। যে যার মতো চাল-ডাল নিয়ে যাচ্ছিল গুদাম ভেঙে। এই অরাজকতার পর আস্তে আস্তে অবশ্য পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। সরকারি ত্রাণবণ্টনের কাজ শুরু হয়। আমরা তখন শ্রীরামদার ওয়ার্ডের যে অংশে থাকতাম, সেই নয়ারহাট এলাকায় সরকারি ত্রাণবণ্টনের দায়িত্ব আমার হাতে আসে। '৬৮-তে আমি ছাত্র পরিষদের পাশাপাশি কংগ্রেস রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। বন্যাত্রাণকে কেন্দ্র করে আমি এবার জড়িয়ে গেলাম সামাজিক কাজে। তাই ১৯৬৮ সালটা আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়।

ওই সময় চার নম্বর ঘুমটির কাছেই ছিল কবলার পট্টি বা মুচিদের এলাকা। এখানে আর্টিজেন গ্রান্ট বিলি বণ্টনের দায়িত্ব এল আমার কাঁধে। সেই গ্রান্টের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ৩৭৫ টাকা। সরকারের তহবিল থেকে সেই অনুদান তুলে এনে বিলি করার দায়িত্ব কবলার পট্টির লোকেরা আমাকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়েছিল। এই সূত্রে লছমন বলে একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নামে কীভাবে জানি দুটো অনুদান মঞ্জুর হয়েছিল। দু'বারই টাকা তুলেছিল সে। তারপর বোধহয় বিবেকের দংশনে আমাকে এসে লছমন জানাল যে, তাকে দু'বার গ্রান্ট পাঠানো হয়েছে। আমি তাকে বললাম, 'যদি আমার কথা শোনো, তবে একটা ফিরিয়ে দাও।' সে রাজি হয়ে বলল যে, ফেরত দিতে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

অনুদানের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নাম বোধহয় রবীনবাবু, টাকা ফেরত পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। সেকালে ওই ৩৭৫ টাকা বেশ ভাল একটা পরিমাণ। একজন গরিব মুচি ওই টাকার প্রলোভন ত্যাগ করেছে দেখে তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'এমনও হয় নাকি?'

এর মধ্যেই হঠাৎ খবর ছড়িয়ে গেল, শচী লালা নাকি কলেজের হলঘরে একজন ছাত্রকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। শহরে খবরটা ছড়াল দাবানলের মতো। অচিরেই দেখা গেল, বিরাট বিরাট সব মিছিল বেরিয়েছে শহরের রাস্তায় এবং প্রতিটি মিছিলেরই গতিপথ শচী লালার বাড়ির দিকে। চোখের সামনে দেখলাম, শচী লালার বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেওয়া হল।

সে বছরই নলিনী স্যারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে আমি গ্র্যাজুয়েট হলাম। আমি হয়েছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ষাণ্মাষিক বিভাগে সেকেন্ড ক্লাস ফিফ্‌থ। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের ঘণ্টাও বেজে গিয়েছে। খগেনবাবুর কথা আগেই বলেছি। তিনি বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন ’৬৭-র নির্বাচনে জলপাইগুড়ি থেকে জিতে। এবার কিন্তু তিনি হেরে গেলেন। সেই প্রথম জলপাইগুড়িতে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থী দিয়েছিল। ’৬৭-তে ফরওয়ার্ড ব্লক আর সিপিআই উভয়েই প্রার্থী দিলেও ’৬৯-এ তাদের সম্মিলিত প্রার্থী ছিলেন নরেশ চক্রবর্তী। খগেনবাবু হেরে গেলেন আড়াই হাজারের মতো ভোটে।

এসবের মধ্যেই ১৯৬৭ থেকে রাজনীতির মঞ্চে ঘটতে শুরু করেছিল আরও একটি ঘটনা। নকশালবাড়িতে কানু সান্যাল আর জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল জমি দখলের লড়াই। এই ঘটনা নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে পরিচিত। ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারীরা সোনম ওয়াংদি নামক একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে হত্যা করেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন, চারু মজুমদারের থিয়োরি... এসব খুব দ্রুত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই আন্দোলনের গোড়ার দিকের বেশ কয়েকজন নেতা উঠে এসেছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এদের মধ্যে চক্রপাণি সাহা, কিষনলাল চ্যাটার্জি, জলপাইগুড়ির একটি মেয়ে কৃষ্ণা চ্যাটার্জি—প্রমুখর নাম মনে আছে আমার। এঁরা সকলেই ছিলেন ‘টার্বুলেন্ট লিডার’।

নকশালবাড়ির প্রভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রেখে পরীক্ষা প্রভৃতি ঠিকমতো নির্বাহ করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অতুলচন্দ্র রায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির ঝুনু রায়ের ভাশুর এবং বিলেতে উচ্চশিক্ষিত মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা যাতে কোনও গোলমালে পণ্ড না হয়ে যায়, সে জন্য তিনি ছাত্র পরিষদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। সেই সূত্রে সেই দায়িত্বের সঙ্গে আমিও জড়িয়ে গেলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চোদ্দোজন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সকলেই নিযুক্ত হবে ছাত্র পরিষদ থেকে।

তখনও নকশালবাড়ির আন্দোলনকারীরা ‘এমএল’ ছাপ গ্রহণ করেনি। বামপন্থী এসএফ নকশালদের সমর্থন করত। তারা জানাল যে, নিরাপত্তাকর্মী থাকলে তাদের দল পরীক্ষা বয়কট করবে। তা অতুলবাবুও ছিলেন বেজায় জেদি মানুষ। তিনি নিরাপত্তাকর্মীদের রেখেই পরীক্ষাগ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর। এর জন্য তিনি পরীক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষার্থীদের সিট ফেললেন। জলপাইগুড়িতে সিট পড়ল বিএড কলেজে। অতুলবাবু জলপাইগুড়ির লোক এবং কংগ্রেসি ঘরানায় বিশ্বাসী হওয়ার সুবাদে চোদ্দোজন নিরাপত্তাকর্মী বাছাইয়ের দায়িত্বটা আমাদের দলের উপরেই পড়ল। দায়িত্ব নিলেন অন্তিদা। তিনি ছিলেন ব্যায়াম করা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলশালী লোক। প্রগতি ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠাতা। ঝুটঝামেলা সামলানোর ব্যাপারে তাঁকে বেশ ভরসা করা যেত। তাই নিরাপত্তাকর্মী বাছাইয়ের ব্যাপারটা তাঁর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হল। তিলি দল বানালেন। শচী লালা, প্রকাশ চক্রবর্তী, আমার দাদা বাবলু—এরা সেই দলে ছিল বলে মনে পড়ছে।

এই নিরাপত্তাবাহিনীর সূত্রেই আমার সঙ্গে অতুলবাবুর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র বিএড কলেজে পরীক্ষা নেওয়াকে কেন্দ্র করে গোলমাল বাধতে দেরি হয়নি। পরীক্ষা না দিতে চাওয়াদের সংখ্যাই দেখা যাচ্ছিল অনেক বেশি। ফলে কলেজের গেট থেকেই শুরু হয়ে গেল গোলমাল। এর মধ্যেই হঠাৎ খবর ছড়িয়ে গেল, শচী লালা নাকি কলেজের হলঘরে একজন ছাত্রকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। শহরে খবরটা ছড়াল দাবানলের মতো। অচিরেই দেখা গেল, বিরাট বিরাট সব মিছিল বেরিয়েছে শহরের রাস্তায় এবং প্রতিটি মিছিলেরই গতিপথ শচী লালার বাড়ির দিকে। আমরা থাকতাম ঠিক তার পাশের বাড়িটাতে। চোখের সামনে দেখলাম, শচী লালার বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেওয়া হল। নীরবে সে দৃশ্য দেখা ছাড়া আমার কিছুই করার ছিল না। প্রতিবাদের কোনও প্রশ্নই নেই।

আমি আজও ঠিক জানি না, সে দিন শচী লালা ছুরি চালিয়েছিল কি না। তবে আঘাত করে থাকলে যে সে খুবই অন্যায় করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

(ক্রমশ)

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

‘বন্ধুগণ! খারাপ কপাল থাকলে আমরা কী কপাল বলি? ঠিক ধরেছেন! সেই কথাটাই আবার আছে— আমার নিজের বাড়ি যেখানে, তার ল্যাজামুড়োয়। তাও যদি না বুঝলেন, তবে ক্লু দিয়ে বলি, এটা জুড়লে স্বয়ং রমণীমোহনও মস্তান বনে যান। এবার বলুন বন্ধুরা! আমি কোথায় থাকি?’

২

‘হড়ি’।
পটলরাম পর্যটককে এটা লিখতে দেখে বললাম, ‘কী গো? হরি বানানটাও ঠিকমতো লিখতে শেখোনি? নাকি হাঁড়ি লিখতে গিয়ে ভুল করেছ?’
‘কোনওটাই না।’ পটল হাস্য করে বলে।
তারপর লেখে ‘মড়ি’।
‘আবার বানান ভুল!’ আমি চেঁচাই।
‘আজ্ঞে না। যে জায়গা যে নিয়মে প্রথমটা, আরেক জায়গা সেই নিয়মে দ্বিতীয়টা। বুঝলে?’
‘বুঝেছি। দুটো জায়গা তো? রিডার ঠিক ধরে ফেলবে।’
বলেই আমি হাওয়া। জিজ্ঞেস করে যদি!

৩

পটলরাম পর্যটনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দাঁড় ভাঙা আর মাছ’-এর প্রথম কবিতা—
উচ্চে তুলিয়া শির,/পাড়ায় পাড়ায় বীর,/
নামিল যুদ্ধে হুহুংকারে/খাইয়া দুগ্ধ ক্ষীর।
পড়ার পর খালি মনে হচ্ছে যে, এটা নিছক কবিতা নয়। এটা একটা নামের ইঙ্গিত।

গতবারের উত্তর—
১) রিশপ, ২) ঘিস নদী আর ওদলাবাড়ি, ৩) জামালদা

প্রথম সঠিক উত্তরদাতা—
সঞ্জয় ঘটক, আলিপুরদুয়ার

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

তরাই উৎরাই

২০

পবন মণ্ডল আতান্তরে পড়েছে খানিকটা। তার ডান হাতের কনুইয়ের কাছে একটা চুলকানি গজিয়েছিল মাসকয়েক আগে। নিখিল ডাক্তার অনেক কৌশল করেও সেটাকে পুরোপুরি তাড়াতে পারছিলেন না কিছুতেই। দু'-দশ দিনের জন্য আরাম পেলেও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠত সেটা। পবন মণ্ডল বাঁশের ব্যবসা করে। বাঁশ হাটিতে খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুরের সময় বারবার কনুই চুলকাতে হলে সমস্যা হয়। খদ্দের দামের বদলে চুলকানির টোটকা নিয়ে আলোচনা মেতে ওঠে। এ পর্যন্ত কয়েক গন্ডা টোটকা প্রয়োগ করে দেখেছে পবন মণ্ডল। কোনওটাই সাত দিনের বেশি আটকে রাখতে পারেনি। শেষে থালা-বাসনের ব্যবসায়ী শিউ প্রসাদের পরামর্শে পপুলার মেডিসিনে গিয়ে অবনী ডাক্তারকে দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল কয়েকটা হলদে বড়ি। সে বড়ি গুঁড়ো করে নারকেল তেল দিয়ে লাগানোর দু'দিনের মাথায় চুলকানি সেই যে গায়েব হয়েছে, গত দু'মাসে আর তার দেখা নেই। ডাক্তারটি ছোকরা হলেও এলেম আছে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা। টাউনের ডাক্তাররা যেসব রোগ সারাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, সেসব রোগ চটপট সেরে যাচ্ছে অবনী ডাক্তারের দুই দাগ মিকচারে।

পবন মণ্ডল চুলকানি সেরে যাওয়ার বৃত্তান্তটা চেপেই গিয়েছিল নিখিল ডাক্তারের কাছে। কিন্তু আজ দুপুর নাগাদ বউয়ের পেটব্যথা আর বমি শুরু হওয়ায় নিখিল ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। তিনি ওষুধপত্র লিখে দেওয়ার পর বেরিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ পবন মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার চুলকানিটার কী হল? ওটা কিন্তু সহজে সারবে না বুঝলে? লাগানোর ওষুধটা বাড়িতে আছে তো?'

পবন মণ্ডল খুব লজ্জিত গলায় বলল, 'সেরে গিয়েছে ডাক্তারবাবু। অবনী ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। বড়ির গুঁড়ো তেল দিয়ে মেখে লাগাতেই সেরে গিয়েছে।'

নিখিল ডাক্তারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। তবুও তিনি শান্ত স্বরে বললেন, 'একদম সেরে গিয়েছে পবন?'

'এই দেখুন না! দাগ অব্দি নেই।'

'সে বড়ি কি আমি তোমায় দিতে পারতাম না পবন? আমি কি সে বড়ির নাম জানি না?'

পবন মণ্ডল তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছি ছি ডাক্তারবাবু! আপনি জানবেন না তা হয়? আসলে আমি ঠিক যেতে চাইনি। কাস্টমার এত করে বলল।'

'ওই হলদে বড়িগুলো একেকটা বিষ বুঝলে?' থমথমে গলায় জানালেন নিখিল ডাক্তার, 'রাতারাতি সেরে যাওয়ায় ভাবছ যে ওই গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার সব জেনে বসে আছে! ওই বড়ির গুঁড়ো মাখার ভবিষ্যৎ জানা আছে? কী ঘটতে পারে জানা আছে কিছু? তা সেরেই যখন গিয়েছে, তখন সেরে যাওয়ার ঠেলা সামলিয়ো। তখন কিন্তু আমি চিকিৎসে করতে পারব না!'

নিখিল ডাক্তার প্রফুল্ল চিত্তে একটা মিকচার বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে ওষুধ নিয়ে রক্ত থেকে সালফারের বংশ উচ্ছেদ করার জন্য দরকারি উপদেশ শ্রবণ করে পবন মণ্ডল যখন নিখিল ডাক্তারের ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে কার্ট রোডের দিকে হাঁটা শুরু করল, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়-হয়। কাছারি আর আপিস ফেরত বাবুদের অনেকেই সভার দিকে যাচ্ছেন। চওড়া রাস্তার পাশে সভাস্থলের সামনে রকমারি ঘোড়ার গাড়ির ভিড়।

কথা শেষ করে বেশ রাগের ভঙ্গিতেই বেরিয়ে গেলেন নিখিল ডাক্তার। ভিজিট পর্যন্ত চাইলেন না। পবন মণ্ডল বুঝল যে ব্যাপারটা ঠিক হল না। হাজার হলেও এদ্দিন ধরে পরিবারের চিকিৎসে করে আসছেন। রাতবিরেতে ডাকলেও চলে আসেন। চাইলে কি হলুদ বড়িগুলো তিনি দিতে পারতেন না?

বিকেল নাগাদ নিখিল ডাক্তারের ওষুধেই বউ খানিকটা ভাল হয়ে যাওয়ায় পবন মণ্ডল ঠিক করলেন খবরটা ডাক্তারকে জানিয়ে আসবেন। ভূতচতুর্দশীর আর দিনকয়েক বাকি। বাতাসে হিম-হিম ভাব এসেছে। ডাক্তারের বাড়ি হয়ে পবন মণ্ডল কার্ট রোডের দিকে যাবে বলে ভাবল। পাটগোলার সামনের মাঠে একটা সভা আছে আজ। সভায় যেতে ভালই লাগে পবন মণ্ডলের। কতজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। ব্যবসার কথাও হয়ে যায় বক্তৃতা শুনতে শুনতে।

কিন্তু নিখিল ডাক্তার তাঁর সাফল্যের সংবাদ শুনে উদাসীন থাকায় পবন মণ্ডলের আতান্তর দশা কাটল না। ডাক্তারের ঘরে তখন গনো চক্কোত্তি ছাড়া আর কেউ নেই। চক্কোত্তি চায়ের আপিসে খাতা লেখার পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চাও করেন। তিনি একটু হেসে বললেন, 'নিখিলের লগ্নে বুধ বসে আছে। ধন্বন্তরির লক্ষণ।'

'কী যে বলেন চক্কোত্তি!' উদাস সুরে বাঁশের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন নিখিল ডাক্তার, 'আমরা তো আর চিকিৎসের নামে রোগীকে সালফার দিতে পারি না। সালফার বুঝলেন তো?'

চক্কোত্তি মাথা নেড়ে বললেন, 'জানি জানি! গন্ধক তো? একেবারে বিষ! পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও, আলাদা কথা। শনির প্রভাব হালকা হবে। কিন্তু চিকিৎসায় নৈব নৈব চ!'

'তবে?' এতক্ষণে নিখিল ডাক্তারের আচরণে উচ্ছ্বাস ফিরে এল— 'মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ দিয়ে এসে সালফার দিয়ে চুলকানি সারাচ্ছে, আর রোগী ভাবছে চুলকানি আর হবে না।'

'এটা কি সম্ভব?' চক্কোতি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

'এইখানেই তো মজা!' নিখিল ডাক্তার সোজা হয়ে বসেন— 'সালফার তো ব্লাডে মিশে গিয়েছে। ব্লাড থেকে সে সালফার বেরবে কী করে?'

'ফোড়া হবে বলছেন?'

'হতে বাধ্য। তখন অস্ত্র না করলে উপায় থাকবে?' কথাটা শেষ করে নিখিল ডাক্তারকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে দেখা গেল। পবন মণ্ডল তা-ই দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'এর কোনও ওষুধ নেই?'

'সেই ওষুধ কি ওই অবনী না নবনী ছোঁড়াটা দিয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'জানতাম না।'

নিখিল ডাক্তার প্রফুল্ল চিত্তে একটা মিকচার বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে ওষুধ নিয়ে রক্ত থেকে সালফারের বংশ উচ্ছেদ করার জন্য দরকারি উপদেশ শ্রবণ করে পবন মণ্ডল যখন নিখিল ডাক্তারের ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে কার্ট রোডের দিকে হাঁটা শুরু করল, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়-হয়। কাছারি আর আপিস ফেরত বাবুদের অনেকেই সভার দিকে যাচ্ছেন। চওড়া রাস্তার পাশে সভাস্থলের সামনে রকমারি ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। উলটো দিকে পাটহাটির মাঠের একটা অংশে আবার রাতে যাত্রার আসর বসবে। কলকাতা থেকে দল এসেছে। সভা শুরু হবে ঠিক ছ'টা থেকে। মঞ্চের দু'পাশে পেট্রোম্যাক্স জ্বালানোর আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। টাউনের কংগ্রেসি নেতাদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে মঞ্চের পাশে। সভায় ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে ছবি দেখানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা উৎসবের পরিবেশ। পবন মণ্ডল সেই উৎসবের একটা কোনায় দাঁড়াল।

কিন্তু পুরোপুরি জমে ওঠার আগেই হইচই আর কোলাহলের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট গুমগুম একটা শব্দ যে উঠে আসছিল, তা কেউ খেয়াল করেনি। আচমকা মাটি দুলতে শুরু করতেই তাই প্রবল ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। শোনা যেতে লাগল শাঁখের ডাক আর উলুধ্বনির শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পর যখন বোঝা গেল যে ভূমিকম্পটা খুব একটা জোরালো হয়নি, তখন আবার সভার কাজে মেতে ওঠা শুরু হল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে একটা মেঘের আস্তরণ সন্ধের আকাশকে ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে হাওয়া বইতে শুরু করল হু হু করে। তারপর আধ ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টির শেষে পরিষ্কার আকাশ তারায় ভরতি হয়ে গেল, তখনও সভা চালানোর মতো লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু পেট্রোম্যাক্সগুলো জ্বালানো গেল না কিছুতেই। পবন মণ্ডল খানিকটা ভিজে আর খানিকটা শুকনো অবস্থায় কী করবে ভাবতে ভাবতে কামারপাড়ার দিকে এগতে টের পেল নাক সুড়সুড় করছে। কিছু বোঝার আগেই প্রবল হাঁচি শুরু হয়ে গেল তার। রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার হাঁচি দিয়ে একটু সামলে নিয়ে দেখল একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ঠান্ডা লাগিয়ে ফেললেন তো?' ব্যক্তিটি হাসিমুখে বলল।

'লেগেই গেল বোধহয়।' ধুতির খুঁট দিয়ে নিচু হয়ে নাক মুছে বলল পবন মণ্ডল, 'সভাটাও পণ্ড হয়ে গেল।'

'কী করবেন বলুন! কাত্তিক মাসে এমন ঝড়বৃষ্টি খুব একটা হয় না। কপাল খারাপ।'

'আপনি কি অর্গানাইজারদের কেউ?'

পবন মণ্ডল জানতে চাইল। হালকা অন্ধকারে ব্যক্তিটিকে পরিষ্কার দেখতে পারছিল না সে।

'আমি সভা শুনতেই এসেছিলাম। একজনের সঙ্গে দেখা হবে বলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার বাড়ি জামালদহে।'

সভায় এসে আজ নতুন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ হয়নি পবন মণ্ডলের। অবশেষে সেই সুযোগ আসায় সে আনন্দিত হল। আরও দু'-তিনটে হাঁচি দিয়ে নাক মুছে আলাপ জুড়ে দিল ব্যক্তিটির সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল আরও একজন। আরও আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল, তিনজন গল্প করতে করতে যাওয়া-আসা করছে কার্ট রোড দিয়ে।

পবন মণ্ডলই কথা বলছিল বেশি। বাকি দু'জন শুনছিল। আসলে দু'জন সময় কাটাচ্ছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কাছে একটা খবর আসবে। উপেন নামক এক ব্যক্তির খবর, যার বিষয়ে পবন মণ্ডল কিছু জানে না। জানবেও না। উপেনের খবর আসবে, না উপেন নিজে আসবে, সেটা নিশ্চিত জানা না থাকায় বাকি দু'জন উত্তেজনায় ছটফট করছিল। নয়ারহাটের আগে রেল লাইনের কাছে রাত আটটার সময় খবর আসবে।

বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বার করে গগনেন্দ্র একবার দেখল। সাড়ে সাতটা। হিদারুকে ইশারায় বুঝিয়ে সদ্য আলাপ হওয়া বাঁশের ব্যবসায়ীটিকে এবার ছাড়তে হবে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

নিরাশ্রয়

বিক্রম অধিকারী

পর্দায় চলছে রগরগে প্রেম। বৈশাখী ভাবে, এখনকার সিনেমাগুলো সুযোগ পেলেই কারণে-অকারণে উত্তাপ ছড়ায়। আজ কিন্তু ওর ভালই লাগছিল। পাশে বসে আছে আবির— ও আবিরের পাশে আরও নিবিড় হতে চায়। বৈশাখী ওর শরীরে একটা অচেনা হাতের চলাফেরা অনুভব করে, আগ্রাসী রাক্ষুসে হাতের স্পর্শ। অন্ধকারেও বুঝতে পারে, এটা আবিরের হাত নয়। ও শিউরে ওঠে, বাঁ দিকে বসে থাকা যুবকটির সিঁধেল হাত ওর গোপন পবিত্রতা লুণ্ঠন করতে চাইছে। সর্বনাশী হাতটা ও সজোরে সরিয়ে দেয়। যেন একটা জোঁকের ছোঁয়ায় ওর গা ঘিনঘিন করতে থাকে। ও চুপ মেরে যায়।

ইন্টারভ্যাল। আবির বাইরে যায়। পাশের জন্তুটা তখনও বসে আছে। সিনেমা হলের আলো নিবে গেলে অস্বস্তি, অন্ধকার ওকে গ্রাস করে। সিনেমা শুরু হতে চলল... আবির ফিরতে দেরি করছে। অন্ধকারের সুযোগে সেই নোংরা হাতটা আবার ওর গায়ে এগিয়ে আসে। ও গর্জে ওঠে, 'নোংরা ইতর! বাড়িতে মা-বোন নেই?' যুবকটার মুখে নির্লজ্জের হাসি, 'ডিয়ার, মা-বোন থাকলে অসুবিধা হবে বুঝি? ঠিক আছে, তোমাকে বরং আমার বাগানবাড়িতেই রাখব।' জবাব শুনে ছেলেটার পাশে বসে থাকা চেলাদের হাসিতে কী শ্বাপদ উল্লাস। ক্রোধে গনগনে বৈশাখী একটা মোক্ষম থাপ্পড় চালায়। যুবকটি খপ করে বৈশাখীর হাত ধরে বলে, 'ডিয়ার, আমার নাম তড়িৎ সেন, বজ্র সেনের ছেলে। ভুলেও টাচ কোরো না, আমার ভোল্টে ভস্ম হয়ে যাবে!'

'পশুর, না না, পাষণ্ডের নাম আগেই শুনেছিলাম— আজ দর্শনের দুর্ভাগ্য হল। আমি তোর শেষ দেখে ছাড়ব।' বৈশাখী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফোঁস করে ওঠে।

আবির এসে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই বৈশাখীর হাত ধরে টানতে টানতে হলের বাইরে বেরিয়ে যায়। বৈশাখী তখন রাগে ফুঁসছে। ওর ধীরস্থির লক্ষ্মীপ্রতিমা রূপে যেন দুর্নিবার দুর্গা ভর করেছে। আবির ভাবে, কোন কুক্ষণে যে আজ সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। বৈশাখী হাপরের মতো শ্বাস নিতে থাকে, 'আমাকে থানায় নিয়ে চলো।' আবির ধীরে বলে, 'লক্ষ্মীটি, একটু ঠান্ডা হও। তুমি তো জানোই, বজ্র সেন পার্টি ও মন্ত্রিত্বের শক্তি ব্যবহার করে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসের চিতা জ্বালিয়ে রেখেছে। আমরা কেন বেকার ওই আগুনে পতঙ্গ হব?' ও ফোঁস করে ওঠে, 'না না, সভ্যতার দোহাই, কোনও প্রতিবাদ কোরো না। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি! আমরাই ভোট দিয়ে এইসব বুনো শুয়োরকে আজ উজির বানিয়েছি! ঠিক আছে, আমি একাই থানায় যাব।' ও জোরে হাঁটা শুরু করে।

হল ভরতি লোকের সামনে একপাল হায়নার হিংস্র হাসিতে নারীত্ব অপমানিত হচ্ছিল, তখন ভিতু-নির্বিকার সবাই সিনেমায় মৌন মশগুল— এ যেন বালিতে মুখ গুঁজে প্রলয় ভুলে থাকার প্রশান্তি। অসুস্থ পচে যাওয়া সমাজ প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গিয়েছে। আবির বাইক নিয়ে ওর পাশে থামে, 'ওঠো, দেখবে থানায় ওর নামে কোনও কমপ্লেন্টই নেবে না।'

বৈশাখীর এই প্রথম থানায় আসা। ও দেখে, মোটা বয়স্ক একটা পুলিশ অফিসার এই সন্ধ্যায় চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। ও গিয়ে একটু জোরে বলে, 'স্যার, আমি এফআইআর করতে চাই।' ঝিমুনি মৌতাতে বাঁধা পড়াতে অফিসারটি বিরক্তিতে বলে, 'ডিউটি অফিসার ওই টেবিলে, ওঁর কাছে যান।'

'কীসের অভিযোগে এফআইআর— রেপ-মার্ডার?' ডিউটি অফিসার জিজ্ঞেস করেন। এই শব্দগুলো শুনে বৈশাখী অনেকটা দমে যায়। ধীরে বলে, 'আমি বজ্র সেনের ছেলে তড়িৎ সেনের নামে এফআইআর করতে চাই।' ডিউটি অফিসার হেসে ওঠে, 'তা তড়িৎবাবু কী কগনিজিবল অপরাধ করল যে এফআইআর করতে হবে, কাউকে রেপ করেছে বুঝি?'

'না, আমি শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানাতে এসেছি, ও আজ সিনেমা হলে আমার সঙ্গে নোংরা ব্যবহার করেছে।' বজ্র সেনের নাম শোনামাত্রই ওসি সাহেব ওঁর টেবিল ছেড়ে বৈশাখীর পাশে এসে দাঁড়ান। বয়স্ক ওসি সাহেব পরম আন্তরিকতায় ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'মা রে, আমি তোর যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। তোর অভিযোগে এফআইআর না, একটা জিডি নেওয়া যেতেই পারে। এর আগেও ওর নামে অনেকে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। তোর সামনে সম্ভাবনাময় অনেক সুন্দর দিন পড়ে আছে, মাথা ঠান্ডা কর। বাড়ি যা— এখানে শুধু আগুনে হাত পুড়বে।' পুলিশের এই আন্তরিকতায় ওর চোখ ছলছল করে। ডিউটি অফিসার হেসে বলেন, 'ম্যাডাম, একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবুন। আপনি তড়িৎ সেনের কিছুই করতে পারবেন না, এই অঞ্চলে কার বুকের পাটা আছে, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? সামনে ইলেকশন। নিজেকে ক্লিন রাখতে উলটে বজ্র স্যারই আপনার গায়ে নারী পাচারকারীর স্ট্যাম্প মেরে দেবেন।'

পরাজিত সৈনিকের যন্ত্রণা নিয়ে বৈশাখী মাথা নিচু করে থানা থেকে বেরিয়ে আসে। শুনতে পায় নিদ্রালু অফিসারটি বলছেন, 'শালা যতসব উটকো ঝামেলা, কোলা ব্যাং এসেছে কেউটে মারতে!' কথাগুলো বৈশাখীর শরীরে বিষ-পিঁপড়ের মতো উঠে আসে। আবির ওর কাঁধে সহমর্মিতার হাত রেখে বলে, 'চলো রেস্টুরেন্টে যাই।' ও গভীর হতাশায় বলে, 'আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি বাড়ি যাব।'

বাড়িতে ফিরে বৈশাখী ভাবতে থাকে কীভাবে তড়িৎ সেনকে শায়েস্তা করা যায়। থানায় দরবার করে লাভ নেই। ও টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে এসপি'র ফোন নম্বর বার করে। পুলিশ সুপারের কাছে কমপ্লেন্ট করলে এখানকার থানা ডায়েরি নিতে বাধ্য হবে। আবিরের ফোন আসে, 'বৈশাখী, লক্ষ্মী আমার, শান্ত হও। এরা সব নিষ্ঠুর সমাজের উৎপাদন। আমাদের কীট-দংশন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। অক্ষম লজ্জায় আমি কাপুরুষের মতো তোমাকে সব ভুলে যেতে বলছি— আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমি কাল ভাগলপুর যাচ্ছি, তুমি ভাল থেকো, শান্ত থেকো, খুব শান্ত।'

বৈশাখীর ভিতরটা দুমড়েমুচড়ে যায়। ওর কাছে আবির ছিল এক আকাশ সুরক্ষা। সব প্রতিবাদ আপসের স্রোতে ধুয়ে সে আজ অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার পুরুষ। আবির কিছুদিন হল চাকরি পেয়েছে, ভাগলপুরে পোস্টিং। বাঁধা মাইনের চাকরিতে আবির এখন কেমন যেন ভিতু ভেড়া হয়ে গিয়েছে। ওর অনুরোধেই বৈশাখী এসপি'কে ফোন করে না। সন্ধ্যায় ওর বাবা অফিস থেকে বাড়িতে ফেরেন, মুখ ভার। বজ্র সেনের অদৃশ্য আগুনের আঁচ ওদের সংসারে। বাবা ছলছল চোখে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, 'মা, কাল থানায় তড়িৎ সেনের নামে অভিযোগ করতে গিয়েছিলি?' ও নিশ্চুপ। 'মা, তুই বোধহয় ভুল করছিস। আমরা সাধারণ মানুষ— ওদের সঙ্গে লড়ার জন্যে অমানুষিক শক্তি কোথায় পাব? আজ অফিসের বস আমাকে ডেকে বলেছেন, মেয়েকে সামলে রাখুন, না হলে এই শেষ বয়সে বিনা প্রোমোশনে ট্রান্সফার নিতে হবে।'

পুলিশ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বৈশাখীকে সজোরে থাপ্পড় মেরে হাতজোড় করে কেঁদে ওঠেন, 'দোহাই, তোর পায়ে পড়ি— তুই এসব পাগলামি বন্ধ কর। এই বুড়ো বয়সে আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দে।'

দোষ করল তড়িৎ সেন, আর সবাই ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন ও-ই অপরাধী। পাশের ঘর থেকে মায়ের কণ্ঠ শোনা যায়, 'এই একগুঁয়ে মেয়ে আমাদের ভোগাবে।' মনে পড়ে, একদিন মা বাবার কাছে আক্ষেপ করছিলেন, 'ইস্, আমাদের বৈশাখী ছেলেদের মতো প্রতিবাদী হয়েছে, ও যে কেন ছেলে হল না।' ওর বিশ্বাস, মা-বাবা যদি জানতেন যে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হতে যাচ্ছে, তাহলে ওর জীবন ভ্রূণেই শেষ হত। ঘরে-বাইরে নারীর মর্যাদা লুণ্ঠিত। নিজেকে অসহায় লাগে, নিজের মা-বাবাও ওর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন না। প্রতিরোধ গড়ে তোলেন না। একদিন জামাইবাবু ওকে একান্তে ঘরে পেয়ে জাপটে ধরেছিল। ও অনেক কষ্টে অজগর-প্যাঁচ থেকে নিজেকে মুক্ত করে মা-র কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলে। মা সব শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'এসব কথা যেন কেউ জানতে না পারে— সামান্য কারণে দিদির সংসারে আগুন লাগিয়ো না।' মা-র ভূমিকায় অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে, মেয়েরা নিরাশ্রয়, অসুরক্ষিত, নিজের বাড়িতেও।

পরের দিন অনেকবার ফোন করার পর এসপি'র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়। এসপি সব শুনে বলেন, 'ওকে, আমি দেখছি। আজকের মধ্যেই আপনি রেজাল্ট পাবেন।' সন্ধ্যায় ওদের বাড়ির গেটে পুলিশ ভ্যান থামে। ওর বাবা সন্ত্রস্ত হয়ে বসার ঘরের দরজা খোলেন। ও জানলা দিয়ে দেখতে পায় পুলিশ ভ্যানের চারপাশে কৌতূহলী প্রতিবেশীদের জটলা। ওসি সাহেব ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কী রে মা, এত বোঝালাম, তবুও গোঁ ধরে আছিস। আমাদের ডিঙিয়ে এসপি'কে কমপ্লেন করে দিলি? ঠিক আছে, এতই যখন আগুন নিয়ে খেলার শখ, আমি তোর ডায়েরি নেব। আমি মেয়ের বাবা, মেয়েদের জ্বালা বেশ বুঝতে পারি, তোকে ভাববার একদিন সময় দিলাম। নিতান্তই যদি চাস, কালকে সন্ধ্যায় থানায় আসবি।' সে দিনের ডিউটি অফিসারের গলায় শ্লেষ, 'গৌরাঙ্গবাবু, তৈরি থাকুন। কাকদ্বীপে আপনার ট্রান্সফার হচ্ছে। আর বৈশাখী ম্যাডাম যে কোনও সময়ে নারী পাচারের অভিযোগে অ্যারেস্ট হতে পারে!'

পুলিশ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বৈশাখীকে সজোরে থাপ্পড় মেরে হাতজোড় করে কেঁদে ওঠেন, 'দোহাই, তোর পায়ে পড়ি— তুই এসব পাগলামি বন্ধ কর। এই বুড়ো বয়সে আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দে।' মায়ের চোখের জল বাইরের ক্রোধ ও আগুন নিবিয়ে দেয়। ভিতরে চলতে থাকা নিঃশব্দ হিরোশিমা বিস্ফোরণ ওকে ঝলসে খাক করে দিতে থাকে।

পরের দিন সকালে বৈশাখী টিউশন পড়াতে বার হয়। প্রতিবেশীরা ওকে এমনভাবে দেখতে থাকে, যেন ও প্রতিবাদ করে খুব অন্যায় করেছে। ভারতে নারী মাতৃরূপে পূজিতা, নারীর হাতেই রাষ্ট্র-রাজ্য-সংসদ পরিচালনার ভার— তবুও এ দেশেই কন্যাভ্রূণ হত্যা, বধূ হত্যা আর প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত নারীর সম্মান। তথ্য অনুযায়ী, নারীদের জন্য বিশ্বে বিপজ্জনক দেশের মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ। হায়, এ দেশে মেয়েরা মায়ের ইউটেরাসেও সুরক্ষিত নয়। কিছুটা রাস্তা যাবার পর ওর সামনে একটা ঝাঁ-চকচকে গাড়ি থামে। দরজা খুলে তড়িৎ সেন বার হয়ে বলে, 'এই যে কালবৈশাখী, দামিনীগিরি বন্ধ করো। না হলে মালালামার্কা প্রতিবাদী মুখ গঙ্গাজলে ধুয়ে রূপ কি রানি বানিয়ে ছাড়ব।' তড়িৎ ওর হাতে একটা খাম গুঁজে দেয়, 'এই খামের মধ্যে তোমার ভবিষ্যতের থোবড়া দেখতে পাবে।'

বৈশাখী খামের ভিতর অ্যাসিড ছুড়ে বিকৃত করে দেওয়া এক যুবতীর বীভৎস মুখের ছবি দেখতে পায়। হিংস্র পুরুষের ভয়ংকর নৃশংসতা দেখে ও কাঁপতে থাকে। ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মাথা ঘুরতে থাকে, ও যেন বেঁকে-তুবড়ে-ঝলসে যায়। দ্রুত বাড়িতে ফিরে আসে। ওকে দেখে মা বলেন, 'কী রে, পড়াতে গেলি না?' ও 'কিছু না' বলে ঘরে ঢোকে। মা বলেন, 'ভালই হল, তুই বাড়িতে থাক, আমি বরং কালী মন্দির থেকে ঘুরে আসি।' মা মন্দিরে চলে যান।

ও তখনও আতঙ্কে কাঁপছে। বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে, নিজের ঘরে এসে আবিরকে ফোন করে, 'আবির, আমাকে বাঁচাও। এখনই এসো। ওরা আমাকে শেষ করে দেবে।' ত্রস্ত কণ্ঠ শুনে আবির ভাবে, বৈশাখীর ক্রোধ এখনও ঠান্ডা হয়নি। ও বৈশাখীকে বোঝায়, 'লক্ষ্মীটি, একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও। নতুন চাকরি, এখন আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া আমি শহিদ হয়ে মোমবাতি মিছিলে প্ল্যাকার্ডে সাঁটা ফোটো হতে চাই না।' ও ব্যাকুল হয়ে বলে, 'তাহলে আমাকে এখনই তোমার ওখানে নিয়ে যাও।' আবির হেসে ওঠে, 'পাগলি, কিছুদিন সময় দাও— তোমাকে গিন্নি বানিয়েই ঘরে আনব!' এই ভয়াল সময়ে আবির ওর ডাকে সাড়া দিল না, নিজেকে খুব অসহায় লাগে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারি করতে থাকে। এই দেশ, এই সমাজ, পরিবার সংগোপনে প্রতিনিয়ত মেয়েদের আত্মাকে হত্যা করে যাচ্ছে। নারীর যন্ত্রণা বুঝি তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার— কেউ তার নির্যাতন প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে না। পুরুষশাসিত এই সমাজ শৈশব থেকেই মেয়েদের জন্য একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি স্থির করে দেয়। রাষ্ট্র-রাজ্য-ধর্ম-সমাজ-পরিবার-ভালবাসার মানুষ প্রত্যেকেই নিজস্ব একটা করে লক্ষ্মণরেখা টেনে দিতে থাকে। ক্রমশ নারীর স্বাধীন স্পেসটা ছোট হতে হতে তার নিজস্ব সত্তাই হারিয়ে যায়। আজ ও এক নিঃসঙ্গ ধ্বস্ত নারী। নেট ঘেঁটে জাতীয় মহিলা কমিশনের ফোন নম্বর বার করে বৈশাখী অনেকবার ফোন করে, কিন্তু প্রতিবারই শুনতে পায়, 'অল দ্য রুটস অব দিস নেটওয়ার্ক ইজ বিজি।' এবার ও শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার জন্য উইমেন হেল্পলাইন নম্বর খুঁজে বার করে।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেয়ে বৈশাখী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, বাড়িতে ও একা। ওই বুঝি তড়িৎ সেন দলবল নিয়ে অ্যাসিড হামলা করতে এসেছে। জানলা দিয়ে দেখতে পায় জামাইবাবু বাড়িতে ঢুকছে। দৌড়ে গিয়ে বসার ঘরের বন্ধ দরজায় তালা লাগিয়ে সব ঘরের জানলা বন্ধ করে দেয়। নিজের ঘরে এসে জানলা-দরজা বন্ধ করে। জামাইবাবু চিৎকার করে ওকে ডাকতে থাকে... ও বন্ধ ঘরের ভিতর চিৎকার করে, 'পাষণ্ড, একা পেয়ে পৌরুষ জাহির করতে এসেছ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' দরজায় ক্রমাগত দুমাদুম শব্দ বাড়তেই থাকে...। ও বুঝতে পারে, পাড়ার সব লোক বাড়িতে ভিড় করছে— করবেই তো! একটা শয়তান, একাকী মেয়েকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। আর তা চেটেপুটে উপভোগ করবে সমগ্র সমাজ। অপরাধী বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর নিরাশ্রয় আক্রান্তের স্থান হবে নিঃসঙ্গ নির্জনে— সেখানেও সে সুরক্ষিত নয়। দরজার শব্দ বিস্ফোরণের রূপ নিচ্ছে, ল্যান্ডফোন আর্তনাদ করছে... ও টিভির টেবিলটা টেনে দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দেয়— নিজেকে আরও সুরক্ষিত করতে চায়। মেয়েদের সতী-সীতা হয়ে স্বেচ্ছাবন্দি থাকতে হবে— বাইরে বার হলেই দশ দিকেই দশানন। মোবাইলে বাবার ফোন আসে, 'এই মা, তোর মা-জামাইবাবু কখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোল, পাড়ার সব লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে।' বসার ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ তীব্রতর হচ্ছে। বাবার কথা কানে যায় না, ও অশরীরী হাসি হেসে অদ্ভুত স্বরে বলে, 'বাবা, বাইরে গণসন্ত্রাস, ওরা দরজা খুললে আমাকে ছিঁড়ে খাবে। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি ওদের মজা দেখাচ্ছি।' ও ফোন কেটে দিয়ে ওপেন হেল্পলাইনের নম্বর ডায়াল করে উৎকর্ণ হয়ে থাকে... শুনতে পায়, 'দ্য ডায়ালড নাম্বার ডাজ নট এগজিস্ট... আপনার ডায়াল করা নম্বরটি বাস্তবে নেই।'

উদ্দাম শরীরি জীবন কাটিয়ে সুষমার দাবি মতো রাম মিশ্র চলেছেন চুড়েল কি টিলা দেখতে। কিন্তু এসে দেখলেন ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে এসে দাঁড়াল একটি বলেরো গাড়ি। মুহূর্তের মধ্যেই কয়েকজন মুখঢাকা লোক তাকে নিস্পন্দ করে দিল। সুষমা দাবি করল পঁচাত্তর লাখ টাকা। ওদিকে জয়গাঁতে প্রসাদকে সাবধানে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে দাশবাবু এসেছেন আলিপুরদুয়ার। সেখানে রাজা রায় নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়, একই দিনে ডুয়ার্সের একাধিক জায়গায়। ওদিকে শ্যামলকে নিয়ে চিন্তিত নবেন্দু মল্লিকও রাজনৈতিক চালে গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত টিভি চ্যানেল মারফত প্রচুর ফুটেজ পেল। সমাজ থেকে রাজনীতির জগৎ ডুয়ার্সের নানা প্রান্তের এইসব রুদ্ধশ্বাস ঘটনার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠছে অন্ধকার ডুয়ার্সের ছবি।

অরণ্য মিত্র

১৩

ডুয়ার্সের অনেক মেয়ে পাচার হয় না। তারা স্বেচ্ছায় যায়। মুনমুন টোপ্পো নিজের ইচ্ছেতেই কাজ নিয়ে গিয়েছে সুরাটে। পাঁপড় কারখানায় কাজ। তার বাইরে মালিক আর দু'-তিনজন খাস লোকের শরীর দলাইমলাই করে দিতে হয়। এর ফলে তাদের ক্লান্তি দূর হয়ে শরীরে জোর ফিরে আসে। তখন মুনমুন টোপ্পোর শরীরের দখল নেয় তারা। কিন্তু বিনিময়ে খাওয়াদাওয়া আছে। নগদ মজুরি আছে। ডুংলিং বাগানে তো সে শুকিয়ে মরত। কতদিন হয়ে গেল বন্ধ। বাঙালি বাবুদের হাতে যদ্দিন ছিল, এমন কিছু হয়নি। ওরা বাগান আর চালাল না। ছবির মতো ডিংলিং চলে গেল মারোদিয়াদের হাতে। তারপর থেকেই যত এলোমেলো হতে শুরু করল। পুরনো বাবু, ম্যানেজার এক-এক করে চলে গেলেন। যাঁরা এলেন, তাঁরা অন্যরকম। দু'বছরের মাথায় পুজোর সাত দিন আগে তালা ঝুলিয়ে চলে গেলেন তাঁরা। বাগান এখন আগাছার জঙ্গল। ভূতের মতো কিছু লোকজন ঘুরে বেড়ায়। যখন-তখন মরে। অথচ এই বাগানে সিনেমার শুটিং হয়েছে। প্রসেনজিৎ এসেছিল।

মুনমুন টোপ্পোও মরে যেত হয়ত। কিন্তু সে-ই বরং ভাল আছে। পাঁপড় বানিয়ে, শরীর বিলিয়ে যা আসছে মাসে, তার একটা অংশ দিয়েই খেয়ে-পরে ভালই আছে তার পরিবার। বাড়ির লোক জানে সে কী করছে, কিন্তু সে নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শুকিয়ে মরার চাইতে এটা অনেক ভাল।

মুনমুন টোপ্পো তিন দিন হল ছুটিতে এসেছে। ফিরবে বড়দিনের পর। তারা খ্রিস্টান। স্বেচ্ছায় পাচার হওয়ার অনেক সুবিধা আছে। নেটওয়ার্কের লোকজনের সঙ্গে খাতির হয়। মুনমুন টোপ্পো নিজে যাওয়ার পরের বছর ছুটিতে এসে নিয়ে গিয়েছিল তিনজনকে। এবারও তিনজন যাবে বলে তৈরি। তারাও যাবে নিজের ইচ্ছেয়। মুনমুন টোপ্পো ডুংলিং বাগান সমেত বন্ধ হওয়া বাগানের কিশোর-তরুণী শ্রমিক মেয়েদের কাছে আদর্শ। হয়ত এবার সংখ্যাটা তিন থেকে বাড়বে। মুনমুন টোপ্পো আশাবাদী যে, এবার যে টাকাটা আসবে তা দিয়ে ঘরের মেরামতির কাজ অনেকটাই হয়ে যাবে।

এর বাইরে অবশ্য তার আরেকটা খোঁজ নেওয়ার আছে। সে শুনেছে, সুষমা এই ডুয়ার্সেই কোথাও আছে। ডুংলিং বাগান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে পলাশছোঁয়া বাগানের মেয়ে সে। চার্চের ইংলিশ মিডিয়ামে ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল। ফাইভের পর এই স্কুলে আর কোনও ক্লাস ছিল না বলে সুষমার পড়া হয়নি। তারপরেও জীবনটা সুখের হতে পারত সুষমার। কিন্তু পলাশছোঁয়া বন্ধ হয়ে গেল। এর কয়েক বছর পরে সুষমা স্বেচ্ছায় কাজ নিয়ে চলে গেল পাটনায়। বিজু প্রসাদের সঙ্গে সুষমাই আলাপ করিয়েছিল মুনমুন টোপ্পোর।

বাস স্ট্যান্ডের পাশে ভাঙাচোরা হাট বসেছে। হাড়িয়া খেয়ে একটা লেবার মেয়েকে নিয়ে গুঁতোগুঁতি করার জন্য জায়গা আছে। এটাই হাটের প্রধান ব্যবসা এখন। দেড় কিলোমিটার দূরে বড় রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায়। বাগান মোড়ে লেবার ছেলেরা সেসব ট্রাকের চালকদের সঙ্গে কথা বলে হাটে পাঠিয়ে দেয়। বাকি হাটে যে বিকিকিনি হয় তা ওই ট্রাক ড্রাইভারদের টাকারই হাতবদল।

মুনমুন টোপ্পো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। এলাকার সবাই তাকে চেনে। কেউ তাকে ঘাঁটায় না। ট্রাক ড্রাইভারদের ধরে নিয়ে আসে যারা, তারা মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে স্বর নামিয়ে জানতে চায় মরদদের জন্য বাইরে

বাগানে ঢোকার মুখে ঝোপজঙ্গলে ভরা জায়গাটায় সরিতাকে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। রেপ করে ফেলে রেখেছে। এখন সে হাসপাতালে। বাঁচার ঠিক নেই। এইসব ঘটনায় একটু উত্তেজনা আর পরিবারের লোকের কান্নাকাটি ছাড়া আর কিছু হয় না। সবাই জানে কারা করে। বেশি আগ্রহ দেখালে রাতের বেলা তুলে নিয়ে যাবে।

কোনও কাজ আছে কি না। সাহসী কেউ কেউ বলে নিজের বোন বা দিদিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। মুনমুন টোপ্পোর ভাল লাগে এসব জিনিস। বন্ধ বাগানের ভুখা লেবারদের জন্য পোকা কিলবিল করা চাল দেখে তার মনে হয়েছে, পাঁপড় কারখানার মালিক অনেক সাচ্চা। বিছানায় মাঝে মাঝে আঁচড়-কামড় দেয় ঠিকই, কিন্তু পয়সা দেয়। পেট ভরে রুটি-সবজি, আচার আর মাঝে মাঝে মিঠাই দেয়। ছুটিও দেয়। আর মালিকের কী দোষ? সে তো দেখছেই যে, বাবু, পুলিশ, নেতা, দারোয়ান, রেলের টিটি, পঞ্চায়েতের মেম্বার— সবাই টাকা খেতে ভালবাসে।

মুনমুন টোপ্পো বানারহাটে যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। সুরাটে তার লোক আসার আগে বলে দিয়েছিল, বানারহাটে বিজু প্রসাদ দেখা করবে। আজকের তারিখটাই বলেছিল। খুব জোরালো কোনও ব্যাপার না ঘটলে চলে আসবে বিজু প্রসাদ। মুনমুন টোপ্পো জানে যে, এদের কাছে কথাটাই সব। বিজু প্রসাদকে মুনমুন এবার বলবে টাকা বাড়ানোর জন্য। ভেবেছিল ভোরের বাস ধরে যাবে। বাস স্ট্যান্ডের কাছেই পাওয়া যাবে বিজু প্রসাদকে। সেখানেই একটা ছোট হোটেলে ওঠে সে। সে হোটেলের ঘরের জানলা দিয়ে বাস স্ট্যান্ডের মুখটা দেখা যায়। মুনমুন সেখানে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে বিজু প্রসাদের। সে মানুষের নাম আর মুখ খুব ভাল মনে রাখতে পারে।

কিন্তু ভোরের বদলে এখন এগারোটার বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছে সে। খুব ভোরে বুধুয়া বেরিয়েছিল। বাগানে ঢোকার মুখে ঝোপজঙ্গলে ভরা জায়গাটায় সরিতাকে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। রেপ করে ফেলে রেখেছে। এখন সে হাসপাতালে। বাঁচার ঠিক নেই। এইসব ঘটনায় একটু উত্তেজনা আর পরিবারের লোকের কান্নাকাটি ছাড়া আর কিছু হয় না। সবাই জানে কারা করে। বেশি আগ্রহ দেখালে রাতের বেলা তুলে নিয়ে যাবে। তারপর 'মিসিং'। মুনমুন জানে। তার এক কাকাও মিসিং।

রাস্তার ওপারে ধনেশ লাকড়া মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। সে এই এলাকায় নেতা মানুষ। নিজের মোটর সাইকেল আছে।

ধনেশের দিকে একবার তাকিয়ে রাস্তায় থুতু ফেলল মুনমুন। বানারহাটে যাওয়ার গাড়িটাকে তখন দেখা গেল চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে আসা আধভাঙা রাস্তাটি দিয়ে।

১৪

ফালাকাটা রোডের বাস স্টপে 'মা ভবানী' বাসটাকে কনক দত্ত পেলেন সকাল আটটা চল্লিশে। এখানে মিনিট দশেক দাঁড়ায় গাড়িটা। কন্ডাক্টর বাস থেকে নেমে ড্রাইভারের জন্য একটা সিগারেট নিয়ে নিজেও একটা ধরাল। কনক দত্ত অপেক্ষা করলেন। জানলা দিয়ে ড্রাইভারের বাড়ানো হাতে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে পিছন ঘুরতেই কনক দত্ত তাঁকে ডাকলেন।

'বলেন?' কন্ডাক্টর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। উমার কাছে থেকে ছেলের একটা পাসপোর্ট ছবি নিয়ে রেখেছিলেন কনক দত্ত। সেটা কন্ডাক্টরের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'একে চেনেন তো? আপনার বন্ধু শুনেছি?'

কন্ডাক্টর বিস্মিত গলায় বলল, 'শ্যামল। শুনলাম সার শ্যামল নাকি মিসিং? কবে থেকে?'

'যে দিন আপনার গাড়িতে ময়নাগুড়ি গেল। এই সকালের ট্রিপে।'

'বলেন কী সার? সে দিন তো ময়নাগুড়িতে নতুনবাজারে নামিয়ে দিলাম ওকে। ফেরার টাইমেও তো ওখানেই দেখলাম। একটা চা-পুরির দোকানের সামনে বসে ছিল। আমার লেট হয়ে যাচ্ছিল, তাও স্লো করিয়ে ডাকলাম। ও বলল শেলিগোড়ি যাবে।'

একটানা কথাগুলো বলে কন্ডাক্টর থামল। সিগারেটটা মুখের সামনে তুলেও নামিয়ে নিল আবার।

'দোকানটায় আমাকে নামিয়ে দিতে পারবেন?'

'ওঠেন সার। পিছনে বোধহয় ফাঁকা আছে। আপনি কি পুলিশের লোক সার?'

'ছিলাম।'

কথাটা বলে কনক দত্ত 'মা ভবানী'র ভিতর ঢুকলেন। একেবারে শেষে পাঁচজনের বসার লম্বা সিটটায় একজন কম আছে চোখে পড়ল।

ধূপগুড়ি থেকে ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে ময়নাগুড়ির নতুনবাজারের সামনে কনক দত্তকে নামিয়ে দিল কন্ডাক্টর। ইশারায় দেখিয়ে দিল রাস্তার ওপারের দোকানটা। টিনের চাল আর বেড়া দেওয়া একটা ঘর। চা, পুরি আর মিষ্টি পাওয়া যায়। দোকানের সামনে একটা ছোট তক্তপোশে ক্যাশবাক্স নিয়ে বোধহয় মালিকই বসে আছে। আরেক পাশে দু'-তিনটে বেঞ্চি। দু'-চারজন খাচ্ছে। কনক দত্ত রাস্তা পেরিয়ে ক্যাশে বসে থাকা বয়স্ক লোকটির সামনে দাঁড়ালেন।

'কিছু কইবেন?'

'এই ফোটোটা একবার দেখবেন? আপনার দোকানে কয়েকদিন আগে এসেছিল।'

লোকটি ফোটোটা কয়েক সেকেন্ড দেখে একটু হেসে বলল, 'নাম তো জানা নাই। তবে এরে মনে আসে। কয়দিন আগে আসছিল। অনেকক্ষণ সিলো। আরেকজনাও আসিল। শুধু বহে থাকে নাই। ভাল খাইসে। চারডা নাগাদ একখান গাড়ি নিয়ে গেল ওদের। যাওয়ার সময় প্রায় দ্যাড়শো টাকা বিল দিসে।'

ঝিমিয়ে থাকা পুলিশি রক্ত আবার জাগতে শুরু করেছে কনক দত্তর ধমনিতে। উত্তেজনা দমন করে তিনি বললেন, 'অনেকক্ষণ ছিল?'

'এই তো, এই টাইম থিকে চারডা পর্যন্ত। গাড়ি আসলো ধরেন চারডার আগে আগে। আরেকটা যেটা সিলো, সে কইল কত হইসে আর কইল মোবাইলে ব্যালেন্স শ্যাস। রিচার্জ কোথায় করবে। আমি পাশের দোকানডা দেখায় দিলাম। রিচার্জ করে আইল। দুইখান অ্যাকশোর নোট দিল। গাড়িডাও আইল তখন। তা সার আপনি কে?'

'ফোটোর ছেলেটার নাম শ্যামল। ওকে সেই দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আরে তা-ই নাকি? বসেন বসেন। এই সেয়ার দে! সা সান সার! সিনি দিবে তো?'

কনক দত্ত এনে দেওয়া লাল রঙের প্লাস্টিকের চেয়ারে বসলেন। লোকটা তাঁর দিকে একটু হেলে পড়ে নিচু গলায় বলল, 'কাগজে পড়লাম কাসিয়াগুড়ির একডা পোলা মিসিং হইসে! এইডাই সেডা?'

'হুঁ। ক্রান্তির রাস্তায় ওই ফোন লাস্ট চালু ছিল।'

লোকটা আরও নিচু গলায় বলল, 'অরা তো সিলিগুড়ি যাওনের কথা কইতেসিল। কেরান্তি যাইল কীভাবে?'

'ওদের আর কী কী কথা শুনেছেন আপনি?'

'আর কিসু না। তা সার, আপনে কি পুলিস?'

কনক দত্ত উত্তরটা অস্পষ্ট রেখে হাসলেন। 'ওই দোকানটায় রিচার্জ করেছিল তা-ই না?'

'হ।'

কনক দত্ত দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলেন। দশ বাই দশ ফুটের ঘর একটা। হরেক মোবাইল কোম্পানির রঙিন চকচকে পোস্টারে ছেয়ে আছে। একটা সদ্য গোঁফ গজানো ছেলে কম্পিউটার মনিটরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী একটা গেম খেলছিল। কনক দত্তকে দেখে বলল, 'রিচার্জ করাবেন কাকু?'

'ক'দিন আগে একজন পরিচিত লোককে

ব্যালেন্স ভরে দিয়েছিলাম এখান থেকে। নাম্বারটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'ডেট মনে আছে কাকু?' ছেলেটি একটা বাঁধানো খাতা টেবিল থেকে টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

'সাতই ডিসেম্বর। এই চারটের একটু আগে আগে।'

ছেলেটা খাতার একটা পাতায় এসে থামল। খাতাটা কনক দত্তর দিকে এগিয়ে বলল, 'এই যে কাকু। দেখে নেন। মনে হয় এইটা আপনার নাম্বার ছিল।'

খাতায় তারিখ আর সময় ধরে রিচার্জ করে দেওয়া ফোনগুলোর নাম্বার, কোম্পানির নাম, টাকার পরিমাণ, রসিদ নাম্বার পরপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। সাত তারিখ তিনটে থেকে চারটের মধ্যে রিচার্জ করা হয়েছে মোটে দুটো নম্বরে। ছেলেটা যে নম্বরটা দেখাচ্ছে, সেটা রিচার্জের সময় লেখা আছে তিনটে পঞ্চাশ। আরেকটা সওয়া তিনটেয়। ছেলেটা তিনটে পঞ্চাশের নাম্বারটার কথাই বলছে কনক দত্তকে।

'এটাই বোধহয়।' কনক দত্ত একটু সংশয়ের সুরে বলতেই ছেলেটা বলল, 'আগের নম্বরটা আমার চেনা কাকু। পানের দোকানের অখিলদার নাম্বার।'

কনক দত্ত ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনটে পঞ্চাশের নম্বরটা মোবাইলে তুলে নিলেন। এখন তিনি পুলিশ নন। তবুও কিছু চেনাজানা আছে। প্রয়োজনে নিজে নিজেই এগবেন। পুলিশজীবনে একটা কথা তিনি বারবার সত্যি হতে দেখেছেন। সেটা হল, অপরাধী সূত্র রেখে যাবেই।

কথাটা আরেকবার সত্য হওয়ায় রীতিমতো উত্তেজনা অনুভব করলেন কনক দত্ত।

১৫

সিরাজুল হকের বেশ নেশা হয়েছে। দাসবাবু তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। নেশার তালে টুকটুক করে অনেক কথাই বলে ফেলছে সিরাজুল। অবশ্য দাসবাবুর সঙ্গে তার বিশ্বাসের সম্পর্ক। এই লাইনে বিশ্বাসই শেষ কথা। সেখানে গোলমাল হলে দীর্ঘদিনের পরিচিতকে চিরতরে সরিয়ে দিতে দু'বার ভাবে না কেউ।

'মাইয়া পাসার করেন! সন্দনের কেসটা ভেবেসেন একবার?' মিটিমিটি হেসে বলল সিরাজুল হক, 'সন্দনের লাইন আসে আপনার?'

'তুমি কি সেই কারণে এসেছ ডুয়ার্সে?'

'কী যে কন!' দাসবাবুর কথায় সিরাজুল বেশ মজা পেল যেন। 'আপনার কয়া যায়। কাল দুইডা তক্ষক ডেলিভারি নিব। কালচিনিতে ডেলিভারি হইব। ক্যাশ সিক্সটি লাখ দাদা! হোটেলের ঘরে ব্যাগের মধ্যে রাখা আসে টাকা।'

'নিজে এসেছ? রিস্ক হয়ে যাবে না?' দাসবাবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তক্ষকের লাইন তাঁরও জানা আছে; কিন্তু সব দিকে জাল ছড়ানো দাসবাবুর পছন্দ নয়। সবাই করে খাক। কিন্তু স্পটে এসে ক্যাশ ডিল করার মতো কাজ দাসবাবু করেন না। তিনি হলে তক্ষক দিল্লি পৌঁছালে ক্যাশ হস্তান্তর করতেন। সিরাজুল হক নবিশ নয়। ব্যাপারটা ভাবায়।

'আরে, কাল সিএম আসছেন জুরান্তি বাগানে।' ছোট্ট এক চুমুক রাম ভিতরে পাঠিয়ে সিরাজুল হক প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কে ধরবে? যে বাঞ্চোদগুলা থাকবে, সেগুলা তো বেইশ্যা। হে হে! ব্যাড টক কয়া দিলাম। ন্যাশা লাগসে তো!'

'এদিকে পুলিশ প্রশাসন তো শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ব্যানার্জির কথায় চলে। সেখানে তোমার লাইন কেমন?'

'মাকন দাদা! মাকন! লাস্ট মান্থ ওই চুতিয়ার এক ফেন্ডের জন্য যা একটা মাইয়া পাঠাইসি না! আঃ, মাগির ইলিশের মতো প্যাট। এঃ! আবার ব্যাড টক কয়া দিলাম!' সিরাজুল আলি ফিসফিস করেই বলল আবার।

দাসবাবু চুপ করে রইলেন। সিরাজুল হক চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে পা নাচাতে লাগল। ওয়েটারটা মিনিট দুয়েক হল আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। এই ফাঁকে সে দাসবাবুর কাছে এসে হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল ক্যাশ কাউন্টারের পাশে রাখা অ্যাকোয়ারিয়ামটা। দাসবাবু সেদিকে তাকাতেই একজন দাঁড়িয়ে থাকা লোক তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। দাসবাবু উঠতে উঠতে সিরাজুল হককে বললেন, 'একটু বোসো। আমি আসছি।'

সিরাজুল কোনও উচ্চবাচ্য করল না। দাসবাবু অ্যাকোয়ারিয়ামটার কাছে এসে দেখলেন কালো উইন্ডচিটার আর নীল জিন্স পরা একটা ছোটখাটো চেহারার লোক। মুখ দেখে মনে হয় রাজবংশী। দাসবাবু কাছে আসতেই সে নিচু গলায় বলল, 'রাজা রায় কাল সকালে আপনার রুমে যাবে। ন'টায়।'

কথাটা বলে ছেলেটা অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে মাছ দেখতে লাগল। তারপর একটা টেবিলে বসে ওয়েটারকে ডেকে দিতে বলল কিছু। দাসবাবুকে যে সে চেনে, এমন কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না তার মধ্যে। দাসবাবু অবশ্য এসবে অভ্যস্ত। তিনি আবার নিজের টেবিলে ফিরে এসে দেখলেন সিরাজুল একইভাবে পা নাচিয়ে যাচ্ছে। তিনি তার কাঁধে দুটো টোকা মেরে ডাকলেন, 'সিরাজুল! এই সিরাজুল! নেশা লেগেছে নাকি?'

সিরাজুল চোখ খুলে হাসল।

'হাসছ যে?'

'আমি সিরাজুল মিঞা দাদা! ন্যাশা আমার লাগে না। পয়সা দিয়া খাইলাম। একটু ঝিম না দিলে উসুল হইব ক্যান?'

'তুমি কি তক্ষকের ডিল সেরে কালই ফিরবে?' দাসবাবু জানতে চাইলেন।

'মাল দাদা খাঁচায় আটকায় এটাসিতে ভইরা পাঠায় দিব। কাটিহারে পার্টির লোক রিসিব নিবে। একেবারে জল কেস।'

তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে আগ্রহের সঙ্গে ফিসফিসে স্বরে জানতে চাইল, 'তক্ষক লয়া কী করে কন তো? সুনসি তো এমন মেডিসিন হয় যে, এক ডোজ দিলে তিন-চারটে মাইয়া কোনও ফ্যাক্টারই না! সইত্যি?'

'জানি না। শুনেছি কিছুই নাকি হয় না। মেডিসিন ব্যাপারটা নাকি রিউমার।'

'কিসু না হইলে একজোড়ার জন্য মাকন দিচ্ছ সিক্সটি লাখ?'

বিস্মিত ভঙ্গিতে কথাটা বলে আরও এক চুমুক রাম কমিয়ে দিল সিরাজুল হক। ঠান্ডা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। সুরাপায়ীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে একটু একটু করে। দাসবাবু এমনটা ভাবেননি। কাছাকাছি টেবিলগুলো সুরাপ্রেমীদের দখলে যেতে শুরু করায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, সিরাজুল হকের সঙ্গে আর কথাবার্তা চালানোটা উচিত হবে না। তাই তিনি বললেন, 'উঠতে হয় সিরাজুল।'

সিরাজুল উঠে পড়ল। দাসবাবুর আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিল মিটিয়ে একটু তরল পায়ে হেঁটে বার হল বার কাম রেস্টুরেন্ট থেকে। দাসবাবুর না বার হলেও চলত। তবুও তিনি বাইরে এলেন। প্রবল কুয়াশায় রাস্তার সোডিয়াম ভেপারের হলদে আলো ছড়িয়ে ভৌতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। কয়েকটা টোটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যাত্রীর আসায়। তার একটাকে ডেকে নিয়ে সিরাজুল হক আবার ফিসফিস করে দাসবাবুর কানের কাছে বলল, 'সন্দনের নিউজ লাগলে বলবেন। আমার কাসে ভাল সেইন আসে।'

দাসবাবু কোনও কিছু না বলে কেবল হাসলেন। চন্দন কাঠের প্রতি এখনই তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। কাঠ চালানের কাজটা ডুয়ার্সের মধ্য দিয়ে ঠিক কোন র‍্যাকেটটা করে, সেটাও একটু অস্পষ্ট তাঁর কাছে।

কিন্তু তারা যে-ই হোক, বুদ্ধ ব্যানার্জি হয়েই আসে। আসতেই হবে। একটা মানুষের নেটওয়ার্ক কত দূর আর কত গভীর পর্যন্ত ছড়ানো থাকতে পারে তা বুদ্ধ ব্যানার্জিকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

খুব তলিয়ে যদি দেখা যেত, তবে বোঝা যেত যে, দাসবাবুর অবচেতনে বুদ্ধ ব্যানার্জির প্রতি এক ধরনের ভাল লাগা আছে।

(ক্রমশ)

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

লক্ষপতি প্রামাণিক, চেয়ারম্যান

মাথাভাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানিয়েছেন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মনীষ গুপ্তর বিদ্যুৎ দপ্তরের অনুদানে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাথাভাঙা শহরে এলইডি লাইটিং এবং ওই দপ্তরের আরও ৪.৫০ লক্ষ টাকা অনুদানে শহরে একাধিক হাইমাস্ট নির্মাণ করা হবে।

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে ও নতুন ড্রেন নির্মাণে দেড় কোটি টাকার অনুদান পাওয়া গিয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

এছাড়া মাথাভাঙার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ শুরু হতে চলেছে।

এছাড়া ঐতিহ্যমন্ডিত মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও শিবমন্দিরের সংস্কারের কাজ শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

চন্দন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান

বর্তমানে যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলছে—

নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার সার্ভের কাজ করে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।

শীঘ্রই শুরু হবে মাথাভাঙা বাজারের আধুনিকীকরণের কাজ। ৬ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার।

বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।

চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার

মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাথাভাঙার ঐতিহ্যমন্ডিত শিবমন্দির

কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।

শহরের রাস্তা ও নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে সারা বছরই।

বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।

দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নে ভেঙে পড়া পৌর-ব্যবস্থাকে সীমিত সামর্থের মধ্যে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাথাভাঙা পৌরসভা।

মাথাভাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নগরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই প্রথম একজন স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। শহরের তিনটি সাব-সেন্টারে সপ্তাহে একদিন করে এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে রোগি দেখবেন ডাক্তার অভিজিৎ সিনহা।

এ ছাড়াও একজন স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এবং একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে ৬৩টি পাকা ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া 'আরবান পুওর' প্রকল্পে ২৪টি ঘর নির্মাণ করে প্রাপকদের প্রদান করা হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। খরচ হবে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

মাথাভাঙা পৌরসভা

নারী দিবস উদ্‌যাপনে

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষরাই একদিন নারীশক্তিকে সামাজিক উন্নতির সোপান ভেবেছিলেন। তাকে ব্যবহার করে, মাতৃত্বের সম্মান দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার কথাও ভেবেছিলেন পুরুষরাই। তাই তাঁদের যথাযথ শিক্ষায় গড়ে তোলা, দরকারে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া— এসব ভাবনাও পুরুষেরই।

কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী নারীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সচেষ্ট হতেই সমাজের ছবিটা গেল পালটে। দীর্ঘকালের বৈষম্য-উপেক্ষা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী এগিয়ে যেতেই সে পথ হয়ে উঠল কণ্টকাকীর্ণ। তবে অমসৃণ পথেও শোনা যেত প্রতিবাদী নারীদের পদধ্বনি। অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ঘিরেই বছরের কোনও না কোনও দিন নারী দিবস হিসেবে পালিত হতে লাগল বিভিন্ন দেশে! সবই তো হল, নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে আর কোনও লড়াই থাকল না আক্ষরিক অর্থে। কিন্তু উদ্ধত পৌরুষ ভিতরে ভিতরে মেনে নিতে পারল না নারীর স্বাধীনতা কিংবা অধিকার। আন্তরিকভাবে মেনে না নেওয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটল বিকৃতি আর বীভৎসতায়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকল ঘাটে-মাঠে, হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে প্রতিনিয়ত।

পৌরুষ দম্ভ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। বুদ্ধিতে, সহিষ্ণুতায়, ধৈর্যে, মানসিক দৃঢ়তায় কোনওভাবেই আটকানো যায় না যাকে, তার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই যখন, তখন তাকে দমানোর একমাত্র উপায় তো সেটাই! কিন্তু এভাবে কি সত্যিই তাকে দমিয়ে রাখা যায়?

নারী দিবসে প্রেরণা

শ্রীমতী যখন ডুয়ার্সের শিশুশিক্ষায় পথ দেখান

পরাধীন দেশ। শিশুশিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো জলপাইগুড়িতে তখন গড়ে ওঠেনি। এগিয়ে এলেন এক দৃঢ়চেতা নারী। তাঁরই উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় তৈরি হল এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে উন্মুক্ত পরিবেশে আনন্দে এবং খেলার মাধ্যমে শিশুর সহজ কোমল অন্তর বিকশিত হয়ে উঠল।

শিশুনিকেতনের প্রতিষ্ঠাত্রী অরুণা দাশগুপ্ত

শিশুর জীবনের প্রথম ছয়টি বছর আমাকে দাও, আমার কোনও দুশ্চিন্তাই নেই বাকি জীবন কে পেল। প্রখ্যাত শিশুমনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েবলের এই উক্তিটিই ছিল অরুণাদেবীর জীবনদর্শন। ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি জন্ম হল তাঁর মানসকন্যা শিশুনিকেতনের। এই বছরই ওই দিনটিতে পূর্ণ হল ৭৫ বছর।

১৯০৬ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে একটি সাধারণ পরিবারে অরুণা দাশগুপ্তর জন্ম। বাবা শশীমোহন দাশগুপ্ত, মা সরলাদেবী। ছেলেবেলা থেকে বাড়ি থেকে দূরে হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা। শিক্ষানুরাগী অরুণাদেবী ২২ বছর বয়সে বিএ পাশ করে চলে এলেন জলপাইগুড়ি। সুনীতিবালা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরি পেলেন। পরের বছর স্বাধীনতা সংগ্রামী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের পর শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সক্রিয়ভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে তিনিও এগিয়ে এলেন, যথারীতি কারান্তরালে যেতে হল দু'জনকেই।

প্রথম সন্তান (মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত) বুবুর জন্মের পর অরুণাদেবী প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে সরে এলেন। তবে তাঁর পরোক্ষ সংগ্রাম থেমে থাকেনি। জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষাব্যবস্থা তখন মোটেই আশানুরূপ নয়। স্বামীর বেশির ভাগ সময়ই কাটে কারান্তরালে। শিশু বুবুর শিক্ষার বিষয়টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। আর্থিক অসচ্ছলতা তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিন তিনটে মেয়েকে নিয়ে পরিবার চালানো তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সেই সময় তিনি এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবলেন, যেখানে এসে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার ভয়, লেখাপড়া শেখার ভীতি দূর হবে। বিদ্যালয়কে নিজের মনে করে শিশুরা ভালবাসবে এর প্রতিটি জিনিস। বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ছুটির ঘণ্টার অপেক্ষা করবে না— এমন পরিবেশ গড়ে তোলা কঠিন ঠিকই, তবে অসম্ভব নয়। চারিত্রিক দৃঢ়তাই সহায় হল তাঁর।

দিনবাজারে বাড়ির বাইরের ঘরে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে শিশুনিকেতনের যাত্রা শুরু হল। ওই সময় বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে বহু পরিশ্রমে নিজের সামান্য পুঁজি ভেঙে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খরচ চালিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, পরাধীন ভারতে শিশুনিকেতনের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য তিনি গ্রহণ করেননি। সেই যুগে একজন মহিলার এই একাকী সংগ্রাম যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন উৎসাহী ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে যেমন সহযোগিতা করেছেন, তেমনই বিভিন্ন চা-বাগান মালিকের সহযোগিতাও পেয়েছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও আর্থিক অনটন লেগেই থাকত। কিন্তু এর পরও যা কিছু করা হত তা পরম নিষ্ঠায় নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হত।

সে সময়ে এবং তারপর বহু বছর পর্যন্ত শিশুনিকেতনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতিটি শিশুকেই পুরস্কার দেওয়া হত। শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ গড়ে তোলাই ছিল এই পুরস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। রঙিন ছবি এঁকে ছড়ার

মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান, ফেলে দেওয়া তুচ্ছ জিনিস থেকে আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করা—এইভাবে শিক্ষাকে মনোগ্রাহী করে তোলার যে ভাবনা এবং উদ্যোগ অরুণাদেবী সেই সময় দেখিয়েছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। শুধু লেখাপড়াই নয়, নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় সব কিছুতেই প্রতিষ্ঠাত্রীর অদম্য উৎসাহ শিশুনিকেতনকে করে তুলেছিল শিশুশিক্ষার্থীর নিজালয়। এখানেই অরুণাদেবীর সাফল্য।

ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। অরুণাদেবীর স্বপ্ন ও সাধনা সাফল্য পেতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিরও পরিবর্তন ঘটেছে। স্বামী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্ত্রী হয়েছেন। সাংসারিক প্রয়োজনে অরুণাদেবীকে কলকাতা নিবাসী হতে হল। তবে দূরত্ব তাঁর কাছে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানসকন্যার টানে বারবার তিনি ছুটে এসেছেন। শিশুনিকেতনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধনে ছেদ পড়েনি কখনও। তাঁর দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে এই বিদ্যানিকেতনের পরিকাঠামো গঠনে।

পাঁচের দশকের প্রথম দিকে শিশুনিকেতন স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান ঠিকানায় এসেছিল। সেই সময় অর্থ সংগ্রহের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এগিয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকর, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য। অরুণাদেবীর উদ্যোগে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি কলকাতার নিউ এম্পায়ার হলে শিশুনিকেতনের ৩৬টি শিশুকে নিয়ে চ্যারিটি শো (অরুণ-বরুণ-কিরণমালা) করিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই অর্থ শিশুনিকেতনের গৃহনির্মাণে খরচ করা হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে ছোট্ট শিশুনিকেতন বড় হয়ে ওঠে।

বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে শিক্ষায়তনের অন্য সব দিক। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এই স্কুল এখন জলপাইগুড়ি শহরের গর্ব। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের পরিবেশ সম্পর্কে যেমন সচেতন করা হয়, তেমনই গড়ে তোলা হয় পরিচ্ছন্নতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, মানবিকতাবোধ। শিশুনিকেতনের মধ্যে দিয়েই বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, সকলের প্রিয় মাসিমা অরুণা দাশগুপ্ত। ১৯৭৯ সালের পর থেকে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর জলপাইগুড়িতে আসতে পারেননি। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই আদর্শে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে আরও কতকগুলি এই ধরনের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

মহুয়া চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- দীপ্তি সেন (অরুণা দাশগুপ্তর দ্বিতীয় কন্যা), আনন্দকমল সেন (দৌহিত্র), অভিজিৎ বসু

যাদের কথা রিপোর্টে নেই

ডুয়ার্সের মেয়ে ফিরে এল গোরক্ষপুর কোঠি থেকে!

বছর দশ আগের কথা

এক নবীন আইনজীবী একদিন এসে উত্তেজিত হয়ে বলল, রাজগঞ্জ অঞ্চলে একটা মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। নিজের বুদ্ধিবলে বেঁচে ফিরেছে। প্রায় এক সপ্তাহ হল রাজগঞ্জ থানাতে অভিযোগ করা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তারা এলাকাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মেয়েটি ও তার পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছে।

গুরুতর অভিযোগ, দেরি করা যায় না। সুতরাং আমরা চার-পাঁচজন পরদিনই একটা গাড়ি ভাড়া করে রাজগঞ্জ চললাম। থানাতে ওসি স্বাভাবিকভাবেই মুখ গোমড়া করে আমাদের অভিযোগ শুনলেন। তারপর বললেন, শুনেছি আপনারা অভিযুক্ত, অভিযোগকারী সবার কথা শোনেন, তারপর রিপোর্ট তৈরি করেন? এ ক্ষেত্রে তা করেছেন কি?

বললাম, না, সেটা করা হয়নি এখনও, করব।

তিনি চশমার উপর দিয়ে দেখে বললেন, তাহলে করুন। তারপর যদি মনে হয় আমি কোনও ভুল কাজ করেছি, বলবেন, মেনে নেব।

আমাদের কৌতূহল হল, তাঁর এই কথা বলবার কারণ জানতে চাইলাম। উনি এবারে একটু হেসে বললেন, যান না, ঘুরে আসুন। নিজেরাই বুঝতে পারবেন।

মেয়েটির বাড়ি

থানা থেকে গাড়িতে মেয়েটির বাড়ি পনেরো মিনিটের রাস্তা। সেখানে যেতেই বাড়ির সকলে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল। বুঝলাম, আগে খবর ছিল, ওরা জানত আমরা যাব। এটা না হলেই ভাল হত। সিমেন্টের পাকা দেয়াল, টিনের চালা। সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি, মুসলিম। এই কৃষক নিজেরা চাষ করেন না, জমি লিজে দিয়ে দেন। পাশাপাশি আলু-পাটের ব্যবসাও করেন। মাঝখানে উঠোন, চারপাশে ঘর। একটা ঘরে বসবার ব্যবস্থা। সকলে বসলাম। মেয়েটির বাবা-মা-ভাই, দু'-একজন কৌতূহলী পড়শির বাইরে উঁকিঝুঁকি।

মেয়ের মা কথার শুরুতেই ঈশ্বরের উদ্দেশে হাতজোড় করলেন— উপরওয়ালার দয়ায় মেয়েকে ফিরে পেয়েছি। এখন আপনারা বিচার করেন, দোষীরা যেন শাস্তি পায়।

মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্রী। নাচ শেখে। বেশ তাগড়া চেহারা। জানা গেল, মেয়ের খুড়তুতো দাদারাই নাকি এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত। বড় ভয়ংকর ব্যাপার। দুই খুড়তুতো দাদা তাদের পরিচিত এক যুবকের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেয়। ছেলেটির বাড়ি ইসলামপুরে। বিয়ের পরে মেয়েকে তার বর বাড়ি নিয়ে যাবার নাম করে ট্রেনে তোলে। তারপর বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে নিয়ে যায় গোরক্ষপুরে। সেখানে একটি বাড়িতে তাকে আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আটকে রাখে। তারপর বেপাত্তা হয়ে যায়।

গোরক্ষপুর কোঠি

—তারপর কী হল? জানতে চাইলাম।

মেয়ে মাথা নিচু করে রইল। মা বলল, প্রথম ক'দিন কিছুই হয়নি। এমনিই ছিল, কেউ খোঁজ করেনি।

—কেউ ছিল না সেখানে?

—হ্যাঁ, ছিল তো, বেশ কয়েকটা লোক ছিল। একটা মেয়েছেলেও ছিল, রান্না করে দিত। আর লোকগুলো পাহারা দিত। বলত, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে জানে মেরে ফেলবে। দু'-তিন দিন পর থেকে ওদের দুপুরের পর বড় গাড়ি করে দূরে একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে নাচগান করতে হত। আবার সেখান থেকে সন্ধ্যার পর ফিরিয়ে আনা হত। নাচগান করতে না চাইলে মারধর করা হত। কুৎসিত গালিগালাজ করা হত। আমরা শুনছি আর আমাদের চোয়াল শক্ত হচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওসি'র উপরে। মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছি পরবর্তী পদক্ষেপের। জিজ্ঞাসা করলাম, নাচগান কারা দেখত? মেয়ে বলল এবার, অনেক লোক আসত। কোথা থেকে আসত কে জানে।

—এভাবে কতদিন ছিলে?

—প্রায় এক সপ্তাহ।

—তারপর পালাতে পারলে? কেমন করে?

—একদিন শরীর ভাল না থাকার ভান করে পড়ে ছিলাম। তাই আমাকে আর নাচগান করতে নিয়ে যায়নি। একাই ছিলাম। সবাই চলে যাবার খানিক পরে দেখি কাছাকাছি কেউ নেই। যে রান্না করে, কেবল সে রান্নাঘরে কাজ

করছে। সেই সুযোগে সেখান থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে দৌড়। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে একেবারে রেল স্টেশন। সেখানে একজন বয়স্ক রেল পুলিশকে সব বলার পর সে আমাকে তিনশো টাকা দিল। তা-ই দিয়ে টিকিট কেটে আমি ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে এসেছি।

ফিরে আসার কথা

রোমহর্ষক কাহিনি, মেয়েটির সাহসের প্রশংসা করছি আমরা নিচু গলায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই বাড়ি থেকে রেল স্টেশন আসার পথ তুমি মনে রেখেছিলে? বাঃ, কেমন রাস্তা— পাকা না কাঁচা?

—পাকা রাস্তা।

—কত দূর রেল স্টেশন থেকে?

—তিন কিলোমিটার হবে।

—বাবাঃ, তুমি তিন কিলোমিটার পথ দৌড়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলে! রাস্তায় কেউ তোমায় দেখেনি?

—না, একদম ফাঁকা ছিল, ধানখেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তো।

—কী বললে! ধানখেতের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তা? অবশ্য হতেও পারে। আমাদের একজন সঙ্গী মন্তব্য করল।

—স্টেশনের নামটা কী?

মেয়েটি এবার একটু অস্থির হয়ে উঠল। বলল, স্টেশনের নাম দেখার মতো অবস্থা ছিল না আমার তখন।

—ঠিকই তো বলছে। আমার এক সাথি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করল। ওই অবস্থায় স্টেশনের নাম জানবার কথা মনে না আসাটাই স্বাভাবিক।

কেমন একটু খটকা লাগল এবার। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন ট্রেনে করে এসেছ?

এবার মেয়ের মা বলল, ওর কি অত মনে আছে, কোন ট্রেনে করে এসেছে?

—টিকিট কেটেছিলে?

—হ্যাঁ।

—টিকিটটা দেখাও তো।

মেয়ের মা জিব কেটে বলল, এই যাঃ, ও তো ঘর পরিষ্কার করার সময় ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

আমি একটু রেগে গেলাম। বললাম, আপনারা কি সাক্ষীসাবুদ সব লোপাট করে দিয়েছেন?

মেয়ের মা বলল, টিকিটের দরকার কী? মেয়ে বলছে তো, আমরা তো সবাই সাক্ষী।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

—না, ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত— সকলের নাগাল পেতে গেলে ওই জায়গাটার নাম জানা জরুরি। এ ছাড়া ওই রেল পুলিশ কনস্টেবলেরও শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ, সে তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তোমার সাহায্যে ওখানকার লোকগুলোকে বমাল ধরতে পারত। একটা ডায়েরি করাও তার কর্তব্য ছিল। সে তা পালন করেনি।

এর পর বললাম, তুমি যে প্রথমে বললে তোমাকে গোরক্ষপুরে নিয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, তা-ই তো। সে উত্তর দিল।

—তাহলে স্টেশনটা গোরক্ষপুরই হবে?

—হ্যাঁ, তা-ই মনে হয়।

—তাহলে গোরক্ষপুর স্টেশন থেকে বার হলেই কি ধানখেত? নাকি লোকালয় ছিল সেখানে? তুমি তো বললে ফাঁকা।

পাশ থেকে আমার এক সঙ্গী বললেন, সে ক্ষেত্রে ওটা হয়ত গোরক্ষপুর স্টেশন ছিল না।

—হবে হয়ত। আসলে আমি তখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য এত টেনশনে ছিলাম।

—তাহলে তুমি কী করে বললে তোমাকে গোরক্ষপুর নিয়ে গিয়েছিল?

মেয়ে চুপ করে নখ দেখতে লাগল।

—হুম, ওখান থেকে সরাসরি এনজেপি এসেছ?

—হ্যাঁ।

—ক'টার সময় পৌঁছেছ?

—ভোরবেলা।

—ভোরবেলা! ওখান থেকে উঠে একেবারে এনজেপি'তে নেমেছ?

—না, নৈহাটিতে নেমে ট্রেন বদল করেছি।

—কখন?

—রাতের বেলা। হাতে ঘড়ি ছিল না। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পেয়ে গিয়েছি।

আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি নৈহাটিতে থাকেন। মাঝে মাঝেই যাতায়াত করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নৈহাটি থেকে রাত, মানে ভোরে কোনও ট্রেন আছে?

—নাঃ, আর তুমি নৈহাটিতেই বা যাবে কেন? গোরক্ষপুর থেকে ট্রেন তো নৈহাটি হয়ে এনজেপি আসে না!

—কী জানি কোন ট্রেনে উঠেছিলাম।

—তোমার কি কিছুই মনে নেই? যারা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কারও নাম?

—না।

—ওদের কথাবার্তা শোনোনি?

—না, মনে নেই।

—ওরা কি তোমাকে মারধর করেছে? বা কোনও রকমের অত্যাচার? মেয়ের মা-কে বললাম, মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েছেন?

—হ্যাঁ, সরকারি হাসপাতালে দেখিয়েছি।

—কাগজ আছে? দেখান তো।

মেয়ের মা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটা টিকিট এনে দিল। মাথার যন্ত্রণা, জ্বর। প্যারাসিটামল আর কাশির একটা সিরাপ।

জিজ্ঞেস করলাম, ফিরে আসবার পর মেয়ের গায়ে কোনও আঘাত বা আঘাতের দাগ ছিল?

—না, তেমন তো মনে পড়ছে না।

—ও যে জামাকাপড় পরে গিয়েছিল, সেগুলো রেখে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, ভাল করে ধুয়ে তুলে রেখেছি।

—অ্যাঁ, ধুয়ে রেখেছেন? সে কী! করেছেন কী! সব প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছেন?

—কেন, ওসব দিয়ে কী হবে? আসল দোষী তো পাড়াতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের ধরে আচ্ছা করে মাইর দিলেই সব বার হয়ে আসবে। পুলিশ তো পয়সা খেয়ে বসে আছে। আগে সে ব্যবস্থা করেন।— এ কথাগুলি মেয়ের বাবা বললেন।

—ওরা রোজ রোজ হুমকি দিচ্ছে, সে দিন বাসিলার ডাং দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিল। সত্যিই তাঁর মাথায় ক'দিনের পুরনো ব্যান্ডেজ।

মেয়েটির কাকার বাড়ি

অভিযুক্তদের বাড়ি অভিযোগকারিণীর বাড়ি থেকে একটা বাড়ি পরেই। আসলে একটাই বিরাট প্রাঙ্গণ। সব শরিকের বাড়ি কাছাকাছি। মেয়ের দুই কাকা। এক কাকা মারা গিয়েছে। সে বাড়িতে কেউ ছিল না সে সময়ে। অভিযুক্ত অপর কাকার দুই ছেলে। সে বাড়িতে গেলাম। তাঁরা ভিতরে ডাকলেন, বসতে বললেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি তো আসতে? তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আপনারা ও বাড়ি থেকে যা শুনলেন, সব কি সত্যি মনে হল?

আমি বললাম, সেটা আপনাকে বলব কেন? আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাই।

দুই ছেলে ও তাদের বাবা। মেয়ের ছোট কাকা। বললেন, আসলে সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল। আমাদের জেলে ঢুকিয়ে জমিজমা নিজেরা দখল করে নেবে।

—কেন হঠাৎ? আপনাদের সম্পত্তি ভাগ করবার দলিল নেই?

—আছে, কিন্তু দাদার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলাম তো, দলিল ওদের কাছে।

—আপনাদের মতে ঘটনাটা কী?

—কিছুই না। ওর বিয়ে দেখাশোনা করেই হয়েছিল, এটা ঠিক যে ঘটকের কাজটা আমার বড় ছেলে করেছিল। ওরই চেনা, একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। সমস্ত নিয়ম মেনেই বিয়ে হয়েছে।

আমি থামালাম— কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে?

—তিন বছর হল, দেখুন না কবালানামা। বড় ছেলেকে বললেন, এনে দেখা তো।

এরপর ৪২ পাতায়

বাউল গানে ভুবনজয়ী ডুয়ার্সকন্যা পার্বতী

পাহাড় ঘেরা তিরুবন্তপুরম। তারই শহরতলিতে সবুজে মোড়া 'একতারা বাউল সংগীত কলারী'। যেদিকেই চোখ যায়, শুধুই সবুজ। গাছ আর গাছ। তাতে কত রকমের ফল ধরে আছে। সারাদিন সেসব গাছে পাখিদের কলতান। আর যখন সেখানে বাউলের একতারা আর গানের সুর ভেসে বেড়ায়, তখন সেই পরিবেশ যেন এক অন্য মাত্রা পায়। মনে হয়, স্বর্গের খুব কাছাকাছি চলে এলাম। এখানেই থাকেন পার্বতী বাউল। সুদূর কেরলে থেকেও মাঝেমধ্যেই তাঁর মন ঘুরে বেড়ায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা প্রিয় শহর কোচবিহারে। স্মৃতিতে ফিরে আসে ফেলে আসা মেয়েবেলা। যেখানে সে ছিল সকলের প্রিয় মৌসুমী পাড়িয়াল।

বাবা রেলের চাকরিসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতেন। আসামের লখিমপুরে ১৯৭৬ সালে মৌসুমীর জন্ম। বেড়ে ওঠা কোচবিহারে। প্রথমে ইন্দিরাদেবী, পরে সুনীতি অ্যাকাডেমিতে ক্লাস সেভেন থেকে। ছোট থেকেই নাচতে ভালবাসত মৌসুমী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার নাচ ছিল বাঁধা। পাশাপাশি ছিল আঁকার হাত। তাই আঁকা শেখাও চলত নিয়ম করে। বড় দুই দিদির মতো তারও গানের গলা ছিল সুরে। সংগীতের তালিম তখন থেকেই। কোচবিহারে থাকতেই ভাওয়াইয়া সংগীতের উপর টান জন্মায়। মাটি-ছোঁয়া লোকগানের সুরে মৌসুমী মজে থাকত।

মাধ্যমিকের পর শান্তিনিকেতনের কলাভবন। সেখানে ক্যাম্পাসে আসতেন ফুলমালা নামে এক বাউল শিল্পী। তাঁর গানে সারা ক্যাম্পাস মেতে উঠত প্রেম আর ভক্তিরসে। সেই সময় থেকেই বাউল গানের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল সে। পার্বতী বাউলের কথায়, 'ফুলমালাদির কাছেই প্রথম বাউল গান সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। কিছুদিন তাঁর কাছে শিখিও। তাঁর কাছেই জানতে পারি, বাউল গান শুধু গান নয়, এক ধরনের সাধনা। সত্যিকারের বাউল হতে গেলে তার জন্য গুরু ধরতে হয়।' অতঃপর শুরু হয় গুরুর সন্ধান। বাউল গানের অন্তহীন পথের খোঁজ যে তাঁকে পেতেই হবে। অশীতিপর বৃদ্ধ সনাতন দাস বাউলকে খুঁজে পেলেন রাঙা মাটির বাঁকুড়ায়। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর তাঁর দীক্ষাগুরু মেলে। সাধনার পাশাপাশি চলে মাধুকরী বৃত্তি। বাউল সাধনা, বাউল সংগীত হল গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুই এখানে পথ দেখান। তিনিই শেখান, সাধনা করতে গেলে কীভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। নিজেকে ভুলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যেতে হয়। এভাবেই কাটে বেশ কয়েকটা বছর।

বাউল গানের সঙ্গে নাচের সঠিক মুদ্রা, ডুগ্গি বাজানো— এগুলিও ততদিনে গুরুর তত্ত্বাবধানেই রপ্ত করেছেন। এর পর সান্নিধ্য পেলেন শশাঙ্ক গোঁসাইয়ের। কিন্তু ৯৭ বছরের ওই বাউল সাধক মহিলা হওয়ার কারণে প্রথমে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। বাউলচর্চার জন্য তাঁর আগ্রহ কতটা তীব্র তা যাচাই করতেই শশাঙ্ক গোঁসাই নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তাঁকে ফেলেন। কিন্তু হার মানতে হয় পার্বতী বাউলের জেদ ও ইচ্ছাশক্তির কাছে। নতুন গুরুর কাছেও বাউল গানের তত্ত্ব ও গভীরতা, বাউলসাধনার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয় তাঁর। সেই যোগফলেই আজ পার্বতী বাউল নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান।

এরই মধ্যে কেরল ভ্রমণ। ততদিনে তিনি অনেকটাই পরিণত, পরিমার্জিতও বটে। কেরলের পার্বতী মন্দিরের এক বৃদ্ধ পুরোহিতই তাঁর নামকরণ করেন— পার্বতী। ১৯৯৭ সালে বিয়ে করলেন কেরালার রবি গোপালন নাইয়ারকে। তিনি নিজেও একজন স্বনামধন্য শিল্পী। তিরুবন্তপুরমে দু'জনে মিলে তৈরি করলেন এক বাউল আখড়া, যেখানে বাউল সংগীতচর্চা, বাউলসাধনা, বিভিন্ন ঘরানার বাউল শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদান চলে নিয়মিত।

সারা বছরই দেশ-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মশালা, বইমেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন পার্বতী বাউল। তবে ডান হাতে একতারা, কটিদেশের বাঁ দিকে বাঁধা ডুগ্গি এবং পায়ে ভারী নূপুর বেঁধে যখন তিনি গেয়ে ওঠেন— 'কিছুদিন মনে মনে, চল দেখি মন ভবপারে' অথবা 'জ্বালায়ে গেলে মনের আগুন' কিংবা 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই', তখন শ্রোতারা চলে যান অন্য ভুবনে। আসলে পার্বতীর গায়কি শ্রোতা-মনে এক দৃশ্যকল্প এঁকে দেয়, যেখানে মন হারিয়ে যেতে বাধ্য। ছোটবেলার চুল আজ পা পর্যন্ত

তখন আমরা আলিপুরদুয়ার জংশনে রেল কোয়ার্টারে থাকি। বুড়িয়া মানে মৌসুমীর বয়স তখন দেড় বছর মতো হবে, সবে হাঁটতে শিখেছে। দোতলার বারান্দা থেকে হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট বাচ্চা একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাকে ডেকে দেখাতেই মা চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, ও তো বুড়িয়া! কখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল! যা, শিগগির ওকে নিয়ে আয়!' আমিও ছুটলাম, ওকে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসি। এর পরও বাড়ি থেকে প্রায়ই বেরিয়ে যেত ও। বড় হওয়া অবধি এটা ছিল। আর আমরা চিন্তায় অস্থির হতাম।

কোচবিহারে বাড়ির পিছনেই ছিল তোর্সা নদী। বুড়িয়া আঁকা শিখত। খুব সুন্দর আঁকত ও। এই আঁকার জন্য প্রায়ই সাইকেল নিয়ে তোর্সার চরে চলে যেত। বাঁধ থেকে নদী পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে যেত। ওখানে এক বুড়ো মাঝির সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। সে ওকে সাইকেল সমেত নদী পার করে দিত। আঁকা হয়ে গেলে আবার ওকে ফেরত নিয়ে আসত। এ জন্য কোনও দিন সেই মাঝিকে পয়সা দিত না। বাড়ি থেকে মোয়াটা, নাড়ুটা নিয়ে যেত সেই মাঝিভাইয়ের জন্য। বাড়ির থেকে বাইরের দিকের টানই ছিল বেশি, ছোট থেকে।

মল্লিকা পাড়িয়াল (মেজদি)

লম্বা জটার রূপ নিয়েছে। গানের মধ্যে লীন হয়ে যখন তিনি ঘুরে ঘুরে নাচ করেন, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য, এক অসাধারণ অনুভূতি।

এখন আর আঁকার জন্য তেমন সময় না থাকলেও সুযোগ পেলেই ছবি আঁকতে তাঁর খুবই ভাল লাগে। যদিও সেই আঁকার ধরন এখন আগের চেয়ে অনেকটাই বদলেছে। সদ্য মুক্তি পাওয়া অপর্ণা সেনের বাংলা ছবি 'আরশিনগর'-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে। তাঁর গাওয়া দু'টি গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। 'সং অব দ্য গ্রেট সেল' নামে বাউল গান ও সাধনার উপর একটি বইও লিখেছেন তিনি। সেখানে তাঁর নিজের কথা ছাড়াও বেশ কিছু আঁকাও রয়েছে।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর মনে উঁকি মারে ফেলে আসা দিনে। পার্বতী বাউলের ভাষায়, 'লোকসংগীত আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই ছিল। আসামের বিহু, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান শুনতে শুনতে বড় হয়েছি, ভালবাসাও সেখান থেকেই।' ছোটবেলায় কোচবিহারে থাকার সময় কাছেই ছিল তোর্সা নদী। আর বাড়ির পাশেই থাকতেন সুশীলা ও ননীবালা বলে দুই বোন। তাঁদের পিসি বলে ডাকতেন তিনি। দোতারা বাজিয়ে তাঁরা গান শোনাতেন ছোট্ট মৌসুমীকে। তাঁদের কাছ থেকে অনেক ভাওয়াইয়া গানও শিখেছিলেন। পরবর্তীতে এই পরিবেশ, প্রকৃতি, সংগীত এবং ডুয়ার্সের শান্ত জীবন পার্বতী বাউলের জীবনে অনেকটা প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, 'ওইরকম গান ছোট থেকে শুনেছিলাম বলেই বোধহয় এত সহজে বাউল গানকে ভালবেসে ফেলেছি।' উত্তরবঙ্গ, বিশেষত কোচবিহার তাঁর স্মৃতিতে ঘুরে-ফিরে আসে বারবার। সেইসব রাস্তাঘাট, স্কুলের মাঠ, আমলকীতলা, টিফিনঘর...। শেষবার কোচবিহার এসেছিলেন ২০০৪ সালে। কোচবিহারের সেই ছোট্ট মৌসুমী আজ খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর জগৎ এখন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক আলাদা। তিনি বাউল সংগীতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চান। তাঁর গুরুদের গানকে বিলিয়ে দিতে চান সব মানুষের মনে। তাঁর মতে, সংগীতের কোনও সীমানা নেই। কোনও পাঁচিল নেই। কোনও গণ্ডিতে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। এর কোনও ভাষা

তখন আমরা কোচবিহারে। ছোট থেকেই পশুপাখিদের প্রতি বুড়িয়ার সহজাত টান। সেই টান এখনও রয়েছে। একবার শীতের রাতে কোচবিহারে খুব জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ ধরে একটা বাচ্চা বেড়ালের কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। একটু পরেই দেখি বুড়িয়া নেই। খানিকক্ষণ পর দেখা গেল, সেই ছোট্ট বিড়াল বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ঢুকছে। ওর কান্নার চোটে বিড়াল বাচ্চার কান্না চাপা পড়ে গিয়েছে। কান্নার কারণ— এখন এই বাচ্চাটাকে ঘরে রাখতে হবে— এতটাই অনুভূতিপ্রবণ ছিল বুড়িয়া।

মঞ্জুশ্রী পাড়িয়াল (বড়দি)

হয় না। তবে বাউল গান বোঝার জন্য চাই অন্য দৃষ্টিভঙ্গি। এর ভাষা বাংলা হলেও সকল বাংলা ভাষীই কি এর অর্থ বোঝে? না হলে বিদেশিরা বাউল গানের জন্য উন্মাদ হয় কেন? বিদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষরাও অনায়াসে এর ভাব অনুধাবন করতে পারেন। বাউল গানের জাদুতে মুগ্ধ হন। কারণ বাউল সংগীত মানুষকে অন্য একটা মানসিক স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে চেতনার জাগরণ ঘটে। পার্বতী বাউল বলেন, বাউল সংগীত এতটাই বিশাল যে, সে যে কোনও জাতির, যে কোনও ধর্মের মানুষকে গ্রহণ করতে পারে। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই তিনি বাউল গান নিয়ে অনুষ্ঠান করে এসেছেন। বিদেশের শ্রোতারা পার্বতী বাউলের পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে বাউল সংগীত আত্মস্থ করতে চায়। পার্বতী বাউল বলেন, নিজের অহংকে ভুলে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সাধনার মধ্যে সমর্পণ না করতে পারলে, গানের মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। বাউল একটা endless journey— এই জগতের আনন্দ অপার। আর তাই পার্বতী বাউল সেই অনন্তের সন্ধানে তাঁর একতারাকে সঙ্গী করে হেঁটে যেতে চান সেই অন্তহীন পথ।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সুনীতি অ্যাকাডেমিতে গ্রুপ ছবিতে

সহপাঠিনীদের স্মৃতি

সুনীতি অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময় অনন্যা মৈত্রর সঙ্গে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। দুই বন্ধুর অনেক মজার ঘটনাও রয়েছে। তার একটা অনন্যার ভাষায়, 'আমরা একবার দু'জনে মিলে বাবুর হাটে একটা চার্চে নান হতে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমরা ক্লাস নাইনে পড়ি। রিসেপশনে বসে ভাবছি, চারদিকে এত দারুণ সব বিদেশি ব্রাদার, ফাদারদের ছবি, এমনই কেউ আসবেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। খানিকক্ষণ পরে একজন কালো সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রাদার এসে অদ্ভুত ইংরেজি অ্যাকসেন্টে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নান হওয়ার সমস্ত ইচ্ছে চলে গেল। প্রচণ্ড হাসতে হাসতে বাইরে এলাম... মউ নাম দিল ব্রাদার দেঁতো।'

আরেক বন্ধু সোমা চৌধুরী এখনও ভুলতে পারেন না ওই দিনটার কথা— 'সুনীতি অ্যাকাডেমি স্কুলের হলঘরে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য হচ্ছে। অভিনয় করতে করতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল মৌসুমী। অভিনয়ের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ও। এতটাই অনুভূতিপ্রবণ ছিল ছোট থেকে।'

কৃতী কন্যা

হাতখরচ বাঁচিয়ে গ্রামের জন্য অ্যাম্বুলেন্স কিনে ফেললেন জয়ানাত

শিলিগুড়ি মহকুমার হেটমুড়ি সিঙ্গিঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালাল গ্রামে না আছে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, না আছে ন্যূনতম চিকিৎসার কোনও সুযোগ-সুবিধা। গ্রামে পাকা রাস্তাও নেই। গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়রান হতে হয় রোগীর বাড়ির লোকজনকে। তা ছাড়া এই গ্রাম থেকে রোগীকে উত্তরবঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও ভরসা সেই রিকশা বা ভ্যান। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, তাতে অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিলেও আসে না। কারণ, এই গ্রামের যে পথঘাট, তার ভিতর অ্যাম্বুলেন্স ঢোকাও সম্ভব নয়।

এই গ্রামেরই বাসিন্দা গবাদি পশু ব্যবসায়ী মহম্মদ রহিমের স্ত্রী জয়ানাত খাতুনকে গ্রামের এই অবস্থা একটুও স্বস্তি দিত না। দু'-একটি ঘটনা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল বেশ। বহুদিন ধরেই মনে মনে তিনি ভাবতেন, কীভাবে এর একটা বিহিত করা যায়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই বা কী, উপায় কই? সাধারণ এক দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ তিনি, এমন কী সম্বল তাঁর আছে, যেখান থেকে তিনি তাঁর ইচ্ছেটুকু পূরণ করতে সমর্থ হবেন? এত কিছু জেনে-বুঝেও কিন্তু জয়ানাত তাঁর ইচ্ছেটুকু মরে যেতে দেননি। বরং অতি যত্নেই তাঁর অন্তরের ইচ্ছেটা লালনপালন করছিলেন। সংসারের জন্য স্বামীর দেওয়া সামান্য টাকা থেকে প্রতিদিন ১০-২০ টাকা বাঁচিয়ে আলাদা করে রাখতেন।

ইতিমধ্যে এসে পড়ে শিলিগুড়ি মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচন। তৃণমূলের টিকিটে জয়ানাত হালাল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার জন্য প্রার্থীও হয়ে যান। গ্রামে শুধু মহিলামহলেই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণেই প্রায় সব মানুষেরই প্রিয়পাত্র। ফলে তাঁর জয়ী হওয়াটা কঠিন কাজ ছিল না। গ্রামের জন্য অনেক কিছু করার দায়িত্ব এসে পড়ে জয়ানাতের কাঁধে। সেই সঙ্গে তাঁর মনের কোণে লুকানো ছিল একটি বাসনা। তার জন্য প্রতীক্ষা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল তাঁর নিজের সংগ্রাম। গ্রামবাসীকে একটা অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়াটাই ছিল জয়ানাতের স্বপ্ন। এবার সেই সুযোগ হল তাঁর।

না, পঞ্চায়েত সদস্যা হয়েছেন বলে সরকারি অর্থ কিংবা সহায়তায় নয়। এতদিন ধরে তিল তিল করে সংসারের খরচ থেকে জমানো টাকা আর তাঁর স্বামীর কাছ থেকে সামান্য অর্থ যোগ করে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ টাকা। তা-ই দিয়েই তিনি কিনে ফেললেন একটি অ্যাম্বুলেন্স, যেটি তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর গ্রামের মানুষদের, যাদের কাছে এতকাল হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ছিল কেবলমাত্র রিকশা আর ভ্যান। তা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হোক কিংবা ফাঁসিদেওয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দরিদ্রতা যাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী, সেই মানুষও তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন নিজেকে নিয়ে নয়, আর পাঁচজন মানুষের জন্য। সেই জয় যে সুনিশ্চিত তা আরও একবার দেখিয়ে দিলেন হালাল গ্রামের গৃহবধূ জয়ানাত খাতুন।

নিজস্ব প্রতিবেদন

যাদের কথা রিপোর্টে নেই

৩৯ পাতার পর

—তারপর? জিজ্ঞেস করলাম।

—তারপর কোনও কারণে ওদের মধ্যে বনিবনা হয়নি। সে জন্য মেয়ে বাড়ি চলে এসেছে গত বছর শেষের দিকে। এর মধ্যে জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু।

—আপনারা মারামারি করেছেন?

—অস্বীকার করব না, কথা কাটাকাটি থেকে ডাণ্ডাডাণ্ডি হয়েছে। কয়েকদিন আগে।

—আপনাদের বিরুদ্ধে ওরা যে অভিযোগ করেছে, সেটা সত্যি হলে আপনাদের কঠিন শাস্তি হবে। জানেন তো?

—সব মিথ্যে, বানানো গল্প। আপনারা সত্যিটা বার করুন। আমরা তা-ই চাই।

বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে বসলাম, চা খেতে হবে।

তরুণ আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী বলো তো? আমার তো ব্যাপারটা কেমন সাজানো সাজানো মনে হচ্ছে। সবটা কি সত্যি? ঠিক করে বলো। পরে সত্যি কথা বার হলে বিপদে পড়বে।

সে একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, তবে আমিও ঠিক জানতাম না। ভাবলাম একটা ভাল কেস। করতে পারলে পেশাটা জমবে। না, আমরা আর থানায় যাইনি।

জাতীশ্বর ভারতী

তক্কাতক্কি

ছোট পোশাকই কারণ হলে আপাদমস্তক ঢাকা সন্ন্যাসিনী ধর্ষিতা হন কেন?

ছোট পোশাকই যদি ধর্ষণের কারণ হত তাহলে আরও বহু মেয়ে ধর্ষিত হত প্রতিদিন। কয়েক মাসের শিশু অথবা মাত্র কয়েক বছরের শিশু যখন কামনার শিকার হয়, তখন ঠিক কোন ধরনের পোশাক তার জন্যে দায়ী তা আজও পরিষ্কার নয় আমাদের কারও কাছেই। প্রশ্ন, আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক পরা খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী ধর্ষিত হন কীভাবে? যদি মেয়েদের ছোট পোশাকই পুরুষদের কামনার আগুনকে বাড়িয়ে তুলে ধর্ষণের কারণ হয়, তবে তো অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পোশাক কোনও বিষয়ই নয়, যা একটি ধর্ষককে উত্তেজিত করে। পোশাক পরিধান প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমালোচনা করা যেতেই পারে, কিন্তু কাউকে বাধ্য করার কোনও জায়গা নেই। ধর্ষকরা বিকৃত ও অস্বাভাবিক মানসিকতার ব্যক্তিবিশেষ, ফলে স্বাভাবিক পুরুষদের সঙ্গে তাদের গতিপ্রকৃতির কার্যকারণও এক হবে না কখনওই। তাই এইসব অস্বাভাবিক পুরুষের কাণ্ডকারখানার কোনও সঠিক কারণানুসন্ধানে না যাওয়াই ভাল বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। মেয়েরা তাদের খুশিমতো পোশাক পরুক।

সুমিত্রা বসাক, গয়েরকাটা

তক্কাতক্কির এ মাসের বিষয়

'একজন সফল পুরুষের পিছনে সবসময়ই একজন নারী থাকেন।' মতামত হতে হবে অনধিক ২০০ শব্দ। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— 'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে- **'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars @gmail.com**

আপনি কি 'এখন ডুয়ার্স'-এ লিখতে চান?

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তাই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১। ই-মেল- srimati.dooars@ gmail.com**

বিপদে পড়লে মহিলারা বিপদসংকেত পাঠাতে পারেন প্রিয়জনদের কাছে

টেক টক

হঠাৎ করেই রিম্পার বাবার বুক কেঁপে ওঠে। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখেন রাত প্রায় ১২টা বাজে। এখনও বাড়ি ফেরেনি রিম্পা। অনেক অভিভাবকেরই এরকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়, যখন তাঁর মেয়ে বা স্ত্রী বা বোন রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি করেন। এর পিছনে অনেক সময়েই কোনও না কোনও কারণ থাকে। এই অবস্থাটা দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পর আরও বেড়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা।

প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করে এই নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে Smartphone-এর বিভিন্ন Application বা App। আজ আমরা এরকম ১০টি App সম্পর্কে জানাব, যার সাহায্যে আমাদের সমাজে মহিলারা আরও এগিয়ে যেতে পারেন নিরাপত্তার সঙ্গে। এই সহজলভ্য App-গুলির মূল কার্যপদ্ধতি কিন্তু প্রায় একই রকম। প্রথমত, ফোন ব্যবহারকারীর একটি পছন্দের জরুরি অবস্থা বা emergency যোগাযোগ তালিকা বা Contact list থাকতে হবে। অর্থাৎ কোনও সমস্যা হলে বা কোনও জরুরি অবস্থা এলে যাঁদের তৎক্ষণাৎ জানানো প্রয়োজন, যেমন— বাবা, মা, দাদা, দিদি, কাকা, কাকিমা, কোনও বন্ধু বা বিশেষ কেউ, যাঁর সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন মানুষের তালিকা, যাঁদের কাছে alarm বাজবে এবং GPS (Global Positioning System)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত অবস্থানের হদিশ দেবে। নতুন App-গুলি ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক সহজ। যখন আগের App-গুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি বোতাম টিপতে হত alarm বাজানোর জন্য। নতুনগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু ফোনের Hardware Part-এর একটি বোতামই কাজ করে এবং একটি বিকট শব্দ তৈরি করে বা ভীষণ কম্পন।

কিছু কিছু App-এর ক্ষেত্রে false incoming call-এর ring বেজে ওঠে। আবার অন্য ক্ষেত্রে ফোনের ক্যামেরা নিজে থেকেই ভিডিয়ো নেওয়া শুরু করে দেয় এবং সেটিকে জায়গামতো পৌঁছাতে থাকে। এবার সেরা কিছু App সম্বন্ধে বিশদে জানা যাক।

১) Smart Shehar Women Safety Shield Protection : এই App আপনাকে সেই মুহূর্তের ছবি নিজে থেকেই তুলতে

সাহায্য করে এবং বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলিও সেই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ফোনে পাঠাতে শুরু করে। বিশদে GPS-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থান, সময় এবং ক্রমাগত বিপদসংকেত বা alarm বাজতে থাকে।

এ ক্ষেত্রে বিপদের সময় যদি কোনওটি হাতছাড়াও হয়ে যায়, তবুও কিছুক্ষণের মধ্যে App-টি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিজেই কাজ করা শুরু করে।

এতে ‘Walk With Me’ বৈশিষ্ট্য আছে, যা সবসময়েই আপনার তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের আপনার অবস্থান জানাতে থাকে।

২) Vithu : এই App-টি ফোনের Power Button-এর মাধ্যমে কাজ শুরু করতে থাকে। এটি মেসেজ পাঠিয়ে দেয় যে, ‘I am in danger, I need help.’ অর্থাৎ ‘আমি বিপদের মধ্যে আছি, আমার সাহায্য দরকার।’ App-টি কাজ শুরু করার পর থেকে ২ মিনিট অন্তর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বিশদে সর্বশেষ জায়গার বিবরণসহ মেসেজ পাঠাতেই থাকে।

৩) Suspects Registry for Women : এটিও অবস্থান জানাতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে এটি জরুরি অবস্থা সম্পর্কে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের অবগত করতেই থাকে, এবং ঘটনার বিবরণ recording হতেই থাকে ও ক্রমাগত খবর পাঠাতে থাকে।

৪) Scream Alarm : এটি একটি মহিলা কণ্ঠে আর্তনাদ করতেই থাকে।

৫) bsafe-share locations : এই App-টি আপনার তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের আপনাকে পিছু নিতে সাহায্য করে। আপনি যদি সময়ে না ফিরে আসেন বা বেশিক্ষণ কোনও যোগাযোগ না করতে পারেন তাহলে এর ৬ timed alarm স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে দেয় এবং নকল ফোন রিং করে পরিচিত ব্যক্তিদের জানান দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে থাকে। এটির ক্ষেত্রে আপনার বর্তমান অবস্থান, ভিডিয়ো ও সাইরেন বাজতে থাকে।

৬) Pukar-A personal safety App: এটি আপনার বর্তমান অবস্থান বিবরণসহ পাঠাতে থাকে আপনার তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ফোনে। এমনকি ফোনটি silent mode-এ অথবা আলো নিবে থাকা অবস্থাতেও এই কাজ করে।

৭) Women Safety Help Totem SOS : এটির দ্বারা আপনি বিপদের মাত্রা অনুযায়ী সংকেত পাঠাতে পারেন। ‘সবুজ’ সংকেত ব্যবহার করতে পারেন যখন নিরাপদ বোধ করছেন, ‘হলুদ’ সংকেতের মাধ্যমে বিপদের আভাস দিতে পারেন, ‘লাল’ সংকেতের মাধ্যমে পুরোপুরি বিপদের ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিতে পারেন। ‘লাল’ সংকেত আপনাকে ১০০-তে ফোন করতে সাহায্য করে, আপনার বর্তমান অবস্থান জানায়, প্রতি ১০ সেকেন্ডে ছবি তুলে পাঠায় আর audio বা শব্দাবলি রেকর্ডিং করে। ‘হলুদ’ সংকেত শুধু আপনার বর্তমান অবস্থান জানায়।

৮) Nirbhaya : Be fearless— এই app-টিও আগে থেকে তৈরি করা অভিভাবকদের তালিকাভুক্তদের সংকেত পাঠায় বর্তমান অবস্থানসহ। এটির ব্যবহারকারী একটি SOS massage-এর মাধ্যমে সংকেত পাঠাতে পারেন। ফোন করতে পারেন বা Facebook status update করতেও পারেন। চরম বিপদের সময় এই app-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ফোনটিকে ঝাঁকানোর মাধ্যমেও সংকেত পাঠানো সম্ভব। এটি প্রতি ৩০০ মিটার অন্তর বা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর আপনার অবস্থানগত বিবরণ আপনার তালিকাভুক্তদের পাঠাতে থাকে।

৯) Safetipin : এটি আপনাকে GPS-এর বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুবিধাগুলি প্রদান করে। আপনাকে নিরাপদ স্থান বা বিপজ্জনক স্থান সম্পর্কে GPS-এর মাধ্যমে ওয়াকিবহাল করে। এটিতে বিপদসংকেত পাঠানোর ও অবস্থান জানানোর সুবিধা যেমন আছে, তেমনই এটি বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহারেরও সুবিধা রয়েছে।

১০) Being Safe : এই App-টিও বিপদের সময়ে নিজের অবস্থান জানাতে সাহায্য করে। কিন্তু এর ক্ষেত্রে সংকেত পাঠানোর ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট তালিকা ছাড়াও ঘটনার আশপাশে থাকা ব্যক্তিরা, যারা ওই নির্দিষ্ট তালিকায় নেই, তারাও সংকেত পেতে থাকবে। এটির সুবিধা-অসুবিধা দুই দিকই আছে।

জয়ন্ত ভৌমিক

স্কোয়াশের চাপড় ঘন্ট

উপকরণ- মসুর ডাল, ছোট ছোট টুকরো করে কাটা স্কোয়াশ, সাদা জিরে, হলুদ, আদা বাটা, তেজপাতা, নুন-মিষ্টি স্বাদমতো, শুকনো ও কাঁচা লংকা।

প্রণালী- মসুর ডাল ভিজিয়ে রেখে বেটে তাতে সামান্য নুন দিয়ে বড়া বানিয়ে নিতে হবে। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে তাতে সাদা জিরে, তেজপাতা ও শুকনো লংকা ফোড়ন দিয়ে, স্কোয়াশের টুকরোগুলো ছেড়ে দিয়ে একটু ভাজা ভাজা হলে, আদা বাটা, লংকা বাটা, হলুদ, নুন ও মিষ্টি দিয়ে ভালভাবে কষাতে হবে। কাঁচা মশলার গন্ধ চলে গেলে জল দিয়ে বড়াগুলো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ফুটে উঠলে বড়ার ভিতরে রস ঢুকবে এবং স্কোয়াশও সেদ্ধ হবে। নামানোর আগে সামান্য ঘি দিতে পারেন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মুক্তি ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি

কাঁচা লংকার শাক-মুগ ডাল

উপকরণ- কচি ডাঁটা সমেত লাউ শাক, মুগ ডাল, বেশ কয়েকটা কাঁচা লংকা, আদা বাটা, ফোড়ন, হলুদ, নুন ও মিষ্টি।

প্রণালী- সামান্য তেল কড়াইতে দিয়ে গরম হলে কাঁচা মুগ ডাল দিয়ে অল্প ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এবার অন্য একটি কড়াইতে আবার তেল দিয়ে কালোজিরে ও কাঁচা লংকা ফোড়ন দিয়ে ডালটা ঢেলে জল দিয়ে দিতে হবে। স্বাদমতো নুন ও মিষ্টি দিতে হবে। ডাল ফুটে যখন অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে আসবে, তখন কচি ডাঁটা সমেত লাউপাতা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে নামানোর সময় কাঁচা লংকাগুলো থেঁতো করে আদা বাটা মিশিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন, ডাল এখানে পাতলা নয়, একটু মাখো-মাখো থাকবে। আর কাঁচা লংকার গন্ধ ডালের সঙ্গে একটা নতুন মাত্রা তৈরি করে।

রত্না গোস্বামী, কোচবিহার

ডুয়ার্সের ডিশ ক্রমেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হচ্ছে তার প্রমাণ 'শ্রীমতী ডুয়ার্স'-এর মেল বক্স ছাড়াও রেসিপির ছড়াছড়ি মূল দপ্তরেও। যাঁরা বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছেন তাঁদেরকে জানাই যেসব রান্না তরাই ডুয়ার্স এলাকায় সাবেকি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দয়া করে ভিনরাজ্যের বা ভিনদেশি প্রচলিত ডিশ লিখে পাঠাবেন না।

ডুয়ার্সে গ্লকোমার প্রাদুর্ভাব বেশি, আজই চোখ দেখান

গ্লকোমা রোগ চোখের পক্ষে নিদারুণ এক অভিশাপ। মার্চ ৮-১৪ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্লকোমা সপ্তাহ। ডুয়ার্স অঞ্চলে গ্লকোমার প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। ডুয়ার্সের অন্যতম চক্ষু বিশেষজ্ঞ **ডা. ডি বি সরকার** গ্লকোমা প্রসঙ্গে জানালেন কয়েকটি জরুরি কথা।

প্র: গ্লকোমা কী কী কারণে হতে পারে?
উ: গ্লকোমা হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। চোখে ছানি পড়ার পরেও সময়মতো চিকিৎসা না করালে সেই ছানি ফেটে গিয়ে বা ফুলে গিয়ে গ্লকোমা হতে পারে। চোখে আঘাত লেগেও গ্লকোমা হওয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বংশগত কারণেও এই রোগ দেখা যায়।

প্র: গ্লকোমা হলে তার উপসর্গ কী কী?
উ: গ্লকোমা সাধারণত তিন প্রকার। প্রথমত, প্রাইমারি গ্লকোমা, যার কোনও উপসর্গ থাকে না। দ্বিতীয়ত, ওপেন অ্যাঙ্গল গ্লকোমা, যা রোগীর চোখের নার্ভকে যথেষ্ট পরিমাণে শুকিয়ে দেয়, রাতে কম দেখাও এই প্রকার গ্লকোমার উপসর্গ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর চোখের কাছের পাওয়ার বেশি হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, ন্যারো অ্যাঙ্গল গ্লকোমা। এই প্রকার গ্লকোমায় আক্রান্ত হলে রোগীর চোখে ব্যথা হয়, বাল্‌বের চারদিকে রামধনুর মতো রং দেখা যায়। জন্মগতভাবে গ্লকোমা থাকলে তার প্রভাব শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বাচ্চাদের তুলনামূলকভাবে চোখ বড় থাকে, সূর্য বা অত্যধিক আলোর দিকে তাকাতে পারে না, চোখের কালো অংশ বা কর্নিয়া খোলা থাকে।

প্র: গ্লকোমা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা কী?
উ: প্রাইমারি গ্লকোমার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে রোগীরা কিছুই টের পান না। পরবর্তীতে এর প্রভাব বেশি হলে চোখ দিয়ে দেখার সীমানা কমে আসতে থাকে। এই সময় দ্রুত বিশেষ কিছু পরীক্ষা করা দরকার। ভাল বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী লেজার অপারেশন করলে চোখের প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রোগ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

প্র: গ্লকোমা প্রতিরোধের উপায় কিছু আছে?
উ: সব ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ লক্ষ করা যায়। উপসর্গ লক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চোখে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। চোখের ডাক্তার না দেখিয়ে শুধুমাত্র পাওয়ার মেপে চশমা নেওয়া উচিত নয়।

প্র: ডুয়ার্সের তিন জেলায় গ্লকোমায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কেমন?
উ: পৃথিবীতে ওপেন অ্যাঙ্গল গ্লকোমায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি হলেও ডুয়ার্স অঞ্চলে সেকেন্ডারি গ্লকোমার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। মোটামুটি ৫-১০ শতাংশ রোগীর গ্লকোমা দেখা যায় ডুয়ার্সে।

প্র: এটি কি বংশগত রোগ?
উ: বংশগত কারণেও গ্লকোমা দেখা যায়। বংশগতভাবে এই রোগ হলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাই দ্রুত এর চিকিৎসা করা উচিত।

প্র: গ্লকোমা হওয়ার কোনও বয়সসীমা আছে, নাকি যে কোনও সময়ে হতে পারে?
উ: মোটামুটি ৪০-৪৫ বছর বয়সের পর সাধারণত দেখা দিলেও, বংশগত বা আঘাত লাগার ফলে গ্লকোমা হলে যে কোনও সময়ই হতে পারে।

শিবশংকর সূত্রধর

শখের বাগান

আপেল কুল চাষ করে আয়

আপেল কুলের কথা দুই বঙ্গের মানুষ এখন প্রায় সবাই জানেন। বাংলাদেশ থেকে কুলের চারা প্রথম দক্ষিণবঙ্গে আসে। ক্রমে তা ডুয়ার্সেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সুমিষ্ট, সুদর্শন এই কুল ভিন রাজ্য থেকে আসা নারকেলে কুলকে প্রায় হটিয়ে দিয়েছে বলা যায়। সরস্বতী পুজোয় আপেল কুলের চাহিদা এখন খুব। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্বমল্লিকপাড়া গ্রামের নবাব আলির জীবন বদলে দিয়েছে আপেল কুল। নবাব আলি আগে স্থানীয় একটি আলুর গদিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। ঘর লাগোয়া জমি পতিত পড়ে থাকত। প্রথম বছর অল্প কয়েকটি আপেল কুলের চারা লাগান। অবাক কাণ্ড! মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই গাছপিছু ১০-১৫ কেজি কুল! গত বছর পাঁচ বিঘা জমির পুরোটাতেই প্রায় ছ'শো গাছ লাগান। এবার ফলের বন্যা এসেছে তাঁর বাগানে। দামও বেশ ভাল পাচ্ছেন। পাইকারি বাজার গড় ২৫-৩০ টাকা/কেজি। গাছপিছু গড়ে ৪০ কেজি ফলন হলে হিসেব করুন কত টাকা আয় করবেন নবাব আলি। নবাবি চাষ আপনিও ইচ্ছে করলে করতে পারেন, বড় সাইজের টবে বা মাটিতে। গাছ পাবেন যে কোনও নার্সারিতে। দাম? ৪০ টাকা প্রতি চারা। লাগাবেন অবশ্যই ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

মেঘপিয়োন

ভাই আমাকে ভুল বুঝেছিল

আমার ভাইকে আমি খুব মিস করি। ও আমাদের ভুল বুঝে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি আর আমার স্বামী ওর চাকরির জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করেছিলাম একটা সময়ে। ও তখন কলেজ থেকে পাশ করে সবেমাত্র বেরিয়েছে। এদিক-ওদিক হন্যে হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছে। আমিও বিভিন্নজনকে বলছি ওর একটা কাজের জন্য, ওর জামাইবাবুও যারপরনাই চেষ্টা করছিলেন।

এরই মধ্যে একজন অসৎ উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে ঢুকে আমার স্বামীকে চাকরির বিনিময়ে টাকার কথা বলে। আমার স্বামীও তাকে এক কথায় টাকা দিয়ে দেয়। আমার ভাইকে বলা হয়, চাকরি পেলে সেই টাকা শোধ করে দিতে। ভাইও তাতে রাজি হয় ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ও যে কত বিষ গোপন করেছিল, আমরা বুঝতেও পারিনি। ওর ধারণা হয়েছিল, আমার স্বামী মানে ওর জামাইবাবুই ওর কাছ থেকে চাকরির বিনিময়ে টাকা চাইছে। ও একটা চিঠি লিখে রেখে হারিয়ে গেল একদিন। মোবাইলে ফোন করে যোগাযোগ করতে চাইলে যোগাযোগ রাখবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। মাঝখান থেকে সেই টাকা আজও ফেরত পেলাম না, ভাইও ভুল বুঝল। সব দিক থেকেই এই দশ বছর পরও দুঃখ ভোলার জায়গায় আমরা নেই। সারাজীবন এই জ্বালা থাকবে যে, ভাইটাই আমাকে ভুল বুঝল!

অমৃতা রায় বর্মন, আলিপুরদুয়ার

'মেঘপিয়োন'-এ আপনারাও নিজেদের কথা শেয়ার করুন। লিখুন অনধিক ৭০০ শব্দে। পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে- 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১। ই-মেল করতে পারেন srimati. dooars@ gmail.com**

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

সেই সলিটারি রিপার...

চিলাপাতার এক ঝকঝকে রিসর্টের কাউন্টারের সামনে বসে আছি। উড়ু-উড়ু মন। সাজানো- গোছানো ওয়াইন শপ। সে অবশ্য আমায় টানে না। আমায় টানছে বন। সদ্য বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কী গাঢ় সবুজ। এক পশলা হেঁটে এসেছি গাড়ি থেকে নেমেই। কটেজগুলোও ঘুরে এলাম। কী নিপাট সাজানো-গোছানো। মনে হচ্ছিল, এই ধবধবে সাদা চাদরে সাজানো বিছানাটায় শুয়ে পড়ি। জানলা দিয়ে আসা একটু রোদ নিয়ে বুঁদ হয়ে বেণু দত্তরায় পড়ি। পড়তে পড়তে তাকে (বেণুবাবু নন!) ভাবি। ঘুম এসে নামুক চোখে। শরীরে। সে-ও নামুক! তারপর একা একা বারান্দায় বসে দূরে চোখ ভাসিয়ে দেওয়া।

এসব ইত্যাদি ভাবনা! লন দিয়ে যখন হেঁটে আসছিলাম, বেশ লাগছিল। দুপুরবেলা। নিঝুম। কেমন মন-কেমন-করা পাখির রমণক্লান্ত ডাক। টকটকে লাল জবা ফুল ফুটেছে। আমার কিন্তু কোনও ঈশ্বর-টিশ্বর মনে পড়ল না। বরঞ্চ তাকে মনে পড়ল।

ওয়েটার বলল, ড্রিঙ্কস সার্ভ করি?

আমি বললাম, না।

এর মধ্যেই ওরা এল। বয়স সাতাশ-আটাশের সুঠাম ছেলেটি। মেয়েটি কত হবে? চোদ্দো-পনেরো। কোনও দ্বিধা নেই। যেন অধিকার! ছেলেটি ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইল, রুম হবে? ঘণ্টা কত করে? —অতীব স্মার্ট। জিন্সের পকেট থেকে উঁকি মারছে হুইস্কির বোতল। মেয়েটি গর্বিত মুখে পুরুষ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে। পকেটের বোতলটি আবার তার দিকে তাকিয়ে!

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, হবে।

—রেন্ট কত?

—এসি? না, নন-এসি?

—এসি।

—তিন হাজার।

—ঘণ্টা সিস্টেম?

—না, একদিনের বুকিং।

—ওকে! একটু তাড়াতাড়ি রুমটা দিন। —তর সইছিল না ছেলেটির। যেন অনেক কাজ বাকি। এখুনি সারতে হবে। আমি দেখছিলাম মেয়েটিকে, নিশ্চয়ই নবম/দশম! স্কুল কামাই দিয়ে বেরিয়েছে। রিসর্টের উঠোনে চকচকে পালসার।

—আই কার্ড দিন। ম্যানেজার বললেন।

ছেলেটি পার্স বার করে ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড এগিয়ে দিল।

—ওঁর? ম্যানেজার মেয়েটির দিকে তাকালেন।

—ওর নেই। আমারটাই যথেষ্ট। তা ছাড়া এই দেখুন, এটা দেখলে আপনি রুম দিয়ে দেবেন! রজনিগন্ধা-খাওয়া দাঁত বার করে কৃতিত্বের হাসি হাসল শ্রীমান।

আমি চুপচাপ দেখছিলাম। মেয়েটি লেপটে গিয়েছে ওর শরীরের সঙ্গে। সেও দ্রুত ঘর চাইছে!

ম্যানেজার বিনীতভাবে বললেন, আপনার ভোটার কার্ডই যথেষ্ট, আপনার এসব কার্ড দেখাবার দরকার নেই। ম্যাডামের কার্ড দিন। না থাকলে রুম দেওয়া যাবে না।

খেপে উঠল ছেলেটি। —আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না! চাইলে উপরি কিছু আপনাকে দিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি রুম দিন তো।

—মাফ করবেন, এরকম নিয়ম আমাদের নেই। ম্যাডামের আই-কার্ড না দেখালে রুম দেওয়া যাবে না।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সে। বাদানুবাদ। চিৎকার-চেঁচামেচি। —এরকম নিয়ম অনেক দেখা আছে! কত হোটেল-রিসর্ট করলাম!... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর পালসার আবার ছুটল। অন্য কোথাও, যেখানে আই-কার্ডের কড়াকড়ি নেই।

আমি ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলাম, পরের কার্ডটি কী?

তিনি বললেন, আর কী বলব মশাই! টুরিস্ট নেই, কিন্তু এরা আসে। হিরোবাবু পুলিশ না আর্মি কীসে যেন কাজ করে। তারই কার্ড দেখাচ্ছিল। ওই আমাকে একটু ভয় দেখানো আর কী! ভাল্লাগে না এসব কাজ করতে।

ভাল প্রচার নেই, যোগাযোগের দারুণ অসুবিধা, লোকাল দাদাদের দাদাগিরি... অনেক উপদ্রব। বছরের অনেকটা সময়ই ফাঁকা পড়ে থাকে ঘর। অথচ স্বর্গের মতো সুন্দর সব। পর্যটকের জন্য উদ্‌গ্রীব বসে থাকলেও যা আসে তা ভাল লাগে না। কিন্তু রিসর্ট চালাতে তো টাকা দরকার! অগত্যা অনেক হোটেল-রিসর্ট...

সেই দুপুরে ওরাও নিশ্চয়ই ঘর পেয়েছিল।

ডুয়ার্স কত পালটে গেল। মদ, আর শরীর শরীর শরীর। সবই সহজলভ্য। আলুর টাকায় ডুয়ার্সের পথপ্রান্তর জুড়ে এখন ফুর্তি! ধাবা আর ইন-এর নতুন ধরনের এনজয়!

আমার মনে পড়ে গেল প্রথম ডুয়ার্স বেড়াতে আসা। ক্লাস ইলেভেন, সদ্য পড়েছি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সলিটারি রিপার'। গুরুদাস স্যার পড়াতে পড়াতে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে!

তারপর প্রিয় বন্ধু প্রদীপকে নিয়ে একদিন সলিটারি রিপারের খোঁজে ডুয়ার্সে চলে আসা। সেই মেয়েটির খোঁজ— যে ভরা ফসলের খেতে হাতে কাস্তে নিয়ে মগ্ন তার কাজে। ফসল কাটছে, আঁটি বাঁধছে। আর স্কটল্যান্ডের কলোকোয়েল ল্যাঙ্গুয়েজে একটি লোকগান গাইছে! সমগ্র নিসর্গ যেন মেয়েটিতে স্থির হয়ে আছে। তার গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না। গানের মানে অজানা। তবু মনে হচ্ছে— শুনি আর শুনি। সব মুহূর্ত থমকে আছে তার কাছে। গান যেন ছবি হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি গাইছে নিজের মনে, আর ফসলের আঁটি বেঁধেই চলেছে।

আমরা চা-বাগানে নেমে পড়লাম। অজানা রাস্তায় হাঁটলাম। কিন্তু তাকে তো খুঁজে পেলাম না। তারপর আবার গাড়ি ধরে ডুয়ার্সের বুক চিরে চলে এলাম ভুটানে। সীমান্ত পেরিয়ে দুই বন্ধু চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। জনপদ পেরিয়ে ভুটানি গাঁয়ে। শুনশান। যেন আমাদের ভূতে পেয়েছে!

হঠাৎ প্রদীপ বলল, দেখো!

তাকিয়ে দেখি সে সত্যি ফসল কাটছে। ভুট্টা, না বাজরা, এখন মনে নেই। এক মনে খেত আলো করে আমার সলিটারি রিপার! আমরা দুই বন্ধু তার শরীর দেখিনি। তার ঠোঁট দেখিনি। তার সদ্য ফুটে ওঠা কোনও ভাঁজ দেখিনি। আমরা যেন দেখছিলাম তার গান। গান বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের ঢালে। তার সাদা হাতে কাস্তে। মলিন পোশাকেও সে যেন রাজকন্যা। রাজকন্যা আবার ফসল তোলে নাকি! সেই কিশোর-কিশোরবেলায় সেসব ভাবার সময় ছিল নাকি! আমরা চুপচাপ। কোথাও কেউ নেই। কিছু দূরে একটি কাঠের আধভাঙা বাড়ি। কেউ নেই বোধহয়।

প্রদীপ বলল, আমরা কিন্তু অনেক দূর চলে এসেছি। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে আমাদের দিকে সেই শুনশান বাড়িটা থেকে একটি কুকুর ছুটে এল। ভুটানি ঝাপুর-ঝুপুর লোমওয়ালা নাদুসনুদুস একটি কুকুর।

প্রদীপ আর আমি দৌড় লাগালাম। পাহাড়ি এবড়োখেবড়ো পথে এ বাঁক-সে বাঁক হয়ে দুই অবাক কিশোরের ফিরে আসা। এখনও কিন্তু সেই ভুটানি সলিটারি রিপার বুকে বসন্ত-দুপুরের গুনগুন গান গায়। মানে বুঝি না।

পথিক বর

কবিতায় এক রহস্যময় উদ্যান

বাংলা ইংরেজির মিশেল কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তর কবিতার বইয়ের শিরোনাম। প্রশ্ন জাগে, বাংলায় কি সত্যিই শব্দে অভাব পড়ল? নাকি জোর করে উত্তর-উত্তরাধুনিক হওয়ার প্রয়াস? সুবৃহৎ কলেবর বইটি কবিতা পাঠকদের নজর কাড়বে, কারণ কবি চিরদিনই রহস্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেন তাঁর নিজস্ব কবিতা-উচ্চারণে। আর এ বই তো পুরোটাই মিস্ট্রি! সূচনাকথনে পুণ্যশ্লোক বলেছেন, 'প্রাইমটাইম বলে আমার কিছু নেই, সেন্সর-ফিল্টার নেই, শুধু আছে কল্পনাশক্তির ভ্যারিয়েশন। মায়াবী রোমান্টিক আমি। দেয়াল আয়নায় ইলিউশন ঝিলিক দিচ্ছে বরাবরের মতো।... অনবরত আমার যাত্রাপথ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ধারণা পালটে নিচ্ছিলাম বারবার। সংক্রামিত উত্তাপ আর শীতল অন্ধকারে। ফলে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে আমার জীবনে। কঠিন অসুখে জর্জরিত স্ত্রী মারা গেলেন আমার চোখের সামনে, সাফল্য না ব্যর্থতার কবিতা লিখছি আমি জানি না। বারবার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কঠিন বাস্তবের, রূপান্তর হচ্ছে আমার নতুন হয়ে ওঠার চিন্তা।'

উত্তরবঙ্গের, ডুয়ার্সের কোনও কবির এত বৃহদায়তনের কাব্যগ্রন্থ খুব কম বেরিয়েছে। দীর্ঘ কবিতারও সন্নিবেশ চোখে পড়ার মতো। আর রয়েছে সিরিজ-কবিতা। তাঁর কবিতার রহস্যঘন ভূখণ্ডে সাইবার স্পেস থেকে আলো পায় গাছেরা, পাখিরা, তেইশ বছরের তরুণী রাধার প্রেম হল অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া! পাহাড়চুড়োয় আকাশ লাফিয়ে ওঠে। কবি শরীরের কাউন্টারে খুলে দেন নতুন রেস্তরাঁ। তাঁর মনে হয়, 'শুচিতা নামের সাদা টুকরোগুলো এক একটা মস্ত জেলখানা'। জটিল সার্জারির পর কয়েক বছর আগে তাঁর বুকে পেসমেকার বসেছে; সেই নার্সিং হোমের স্মৃতি নিয়ে রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। অসুখের দিনগুলিকে এভাবে কবিতার মোড়কে ধরে রাখবার দৃষ্টান্ত বাংলা কবিতায় প্রায় বিরল। চেতন-অবচেতনের অদ্ভুত রহস্যমদির অনেক অসাধারণ পঙ্‌ক্তি অবাক করে দেয়। সেখানে কবিতার চরিত্র হয়ে যান নার্সিং হোমের মেট্রন-নার্স সবাই। শাবানা বা কাজরি পর্বের কবিতাগুলিতে কবির পরিণত প্রেমের কথা তীব্রভাবে উঠে আসে। জুবিনপর্বও তো প্রেমেরই কবিতা। তবে বাংলা কাব্যে পুরুষ প্রেমিক নিয়ে পুরুষ কবির লেখা কবিতা আছে কি! কবিতার বইয়ের পাতা জুড়ে যেমন রহস্য, তেমনি শরীরী চাওয়ার সুতীব্র সংকেত, মদ ও মদিরতার নেশা-নেশা রং। আবার তার মধ্য থেকেই পুণ্যশ্লোকের বিষণ্ণতা, একলা হবার যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় উত্তরের জনপদ, বন, নদী। সব কিছুই কুয়াশায় ঢাকা।

কুয়াশার বাগান— এ লিটল মিস্ট্রি, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা-১২, মূল্য ৩৫০ টাকা

কবিতায় যথার্থ বাক্যটি লেখার জন্য

'কবিতা লেখা, আমার কাছে, নিজেকে চাবকে সোজা রাখা'। মাথাভাঙায় বসে কবিতা নিয়ে অন্যরকম কাজ করে চলেছেন নিত্য মালাকার। কবিতার বড় পরিসরে তিনি এখন স্বীকৃত নাম। তবে তাঁর কবিতা আত্মস্থ করতে হলে পাঠে অত্যন্ত মনস্ক হওয়া প্রয়োজন।

বর্ষীয়ান কবি ভাবেন, 'আমার এখন কেউ কিচ্ছু নেই সব দিকে ধু-ধু/ তবে কি পৌঁছে গেছি অবশেষে নিরঙ্কুশ যথার্থের পটে'! তাঁর অনুভব— 'সেদিন আয়না ফেটে চৌচির হবে/ অবয়ব খুঁজতে কেউ এগিয়ে আসবে না/ আলো নিবে যাবে আর সুড়ঙ্গযাত্রা শুরু হবে'। পিছনে মায়া আলো দেখে তাঁর প্রিয় রমণীর চোখে লিরিক ঘনায়। তিনি ভাবেন, চাঁদের আলোয় মিলেমিশে বানভাসি পদ্মা-মেঘনার সঙ্গে রুটি শাড়ি স্তোকবাক্য ছাপিয়ে দু'হাতে আলো হাসি দিতে পারে এক নারী, চাঁদের কার্নিশে। ইদানীং তার 'হাসির আলোকিত অংশে সূচিত হয় মন্থর নদীর গল্প'।

কবি দেখেন কখন কীভাবে যেন শাপলা, ছায়াবতী বাঁশবন ও বিমুগ্ধ সূর্য একসঙ্গে একই কাতারে এসে যৌথ কথা গাইছে। তাঁর পরিণত বয়সের কথা কী সুন্দরভাবে বলে দেন— 'আজকাল গ্রিলের এপারে চেয়ারে এলিয়ে গা খরার বাগানে আমি/ একটা মরা নদীর গল্পে মাছ নয় আঁকে-বাঁকে বাঁশগাছ কলাগাছ/ মধুযামিনীর গান দেখি, শুনি, আঁকি'। আবার ফেলে আসাকেও তাঁর মতো করে আবাহন করেছেন, 'হে ধূসর, অলস অতীত তুমি, এইখানে এসো/ তুখোড় তর্কের রাতে তিন পেগ শ্রাবণের মতো ভালোবেসো'। সারা বই জুড়ে কবিতায় কবিতায় যেন কবির নিজস্ব যথার্থ বাক্যটি লেখার এক ব্যাপ্ত অনুসন্ধিৎসা। আর তাই বারবার পড়তে হয় কবিতাগুলি।

যথার্থ বাক্যটি রচনার স্বার্থে, নিত্য মালাকার, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা-১২, ৮০ টাকা

সৃজন বিশ্বাস

ডুয়ার্সবাসীর বেড়ানোর গাইড

উত্তরবাংলার প্রাকৃতিক রূপকে রসিক খুঁটিয়ে দেখলে জীবনবোধের এক তন্ময় জগৎ গড়ে ওঠে। প্রকৃতির খোঁজে তৈরি হয় সেই জায়গার আত্মপরিচয়ের কাহিনি। লেখক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য যেহেতু ডুয়ার্সের বাসিন্দা তাই তাঁর একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। তাঁর এই আত্মপোলব্ধি দৃশ্যায়িত হয়ে ওঠে ডুয়ার্সের অরণ্য পর্বতের যুগধর্ম ও সমাজ বিন্যাসের বহু স্তরীয় সীমানা। ডুয়ার্সের আনাচকানাচকে আরও প্রসারিত করেছে আলোচ্য বইটির বিষয়ভিত্তি। ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে ভিত্তি করে আর তাঁর জীবন-বাস্তবতার উপাদানে নির্ভর করে আলেখ্য বর্ণনা করেছেন অনেকেই। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের নিরীক্ষায় ডুয়ার্সের পর্যটন কেন্দ্রগুলি একটি বিশেষ শিল্পিত কাহিনি তৈরি করেছে।

তোর্সা, হলং, চিরখাওয়া, মালঙ্গী, কালিঝোরা, সিসমারা, বুড়িবসরা, বুড়িতোর্সা, ভালুক, সুকতা গরুমারা এই এতগুলো নদী বয়ে গিয়েছে জলদাপাড়া অভয় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। এই বিস্তির্ণ সবুজের আসল ঐশ্বর্য হল এখনকার লুপ্তপ্রায় এক শৃঙ্গ গন্ডার। এই অরণ্যে কী নেই? রয়েছে বাঘ, লেপার্ড, ভোদড়, বনবিড়াল, প্যাঙ্গোলিন। শজারুও আছে এখানে। বইতে এই অনুপুঙ্খ বিবরণ ছাড়াও আছে আপনার রুকস্যাকে কী কী রাখা দরকার, কোথায় কত টাকায় থাকা যায়, বুকিং, গ্রিন টিপস্ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানা তথ্য।

বইটি প্রকাশ কবেছে রংরুট হলিডেইয়ার। যোগ্য পাণ্ডুলিপিকে উপযুক্ত মর্যাদাই দিয়েছেন তারা। পর্যটক চাইলে সঙ্গে নিয়েই ডুয়ার্স রওনা দিতে পারেন। চেনা শোনা ছাড়াও বইটিতে মিলবে বহু অজানা গন্তব্যের হদিস। টুকরো টুকরো লেখার ফাঁক ফোকরে লেখক যে সাহিত্য-স্পর্ষ রেখেছেন তা মনকে এক ধরনের ভাল লাগা দেয়। পড়তে পড়তে বহু সময়েই মনে হয় যেন সেই অরণ্যের গভীরে ঢুকে চলেছি। অতি যত্ন নিয়ে ছাপা বইটির ছবিগুলিও ঝকঝকে, বাঁধাই বেশ শক্তপোক্ত। বনবাংলোয় চায়ের জমাটি আসরে চায়ের কাপ-টাপও রাখা যেতে পারে অনায়াসেই। পর্যটক ছাড়াও পাঠকদেরও বলব, বইটি পড়ুন। তারপর বইটি অনন্যসুন্দর, না অসাধারণ সুন্দর তার বিচার করুন, সে ভার আপনাদের হাতে।

বাংলার উত্তরে টই টই। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। রংরুট হলিডেইয়ার। মূল্য ১০০ টাকা।

ব্রততী ঘোষ

অন লাইনে প্রাপ্তিস্থান www.boimela.in

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় রংরুটের বই। পাওয়া যাবে 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে। ১১-২০ মার্চ

মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ১৫০ টাকা

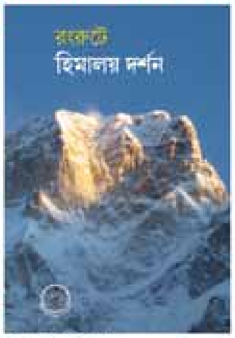

মূল্য ২০০ টাকা

মূল্য ১০০ টাকা

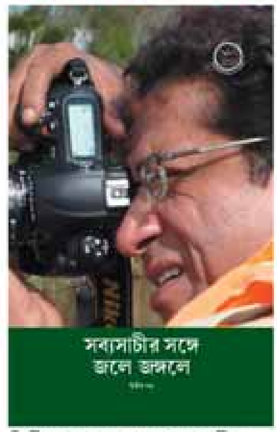

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

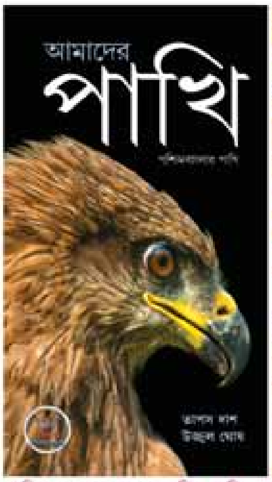

পশ্চিমবাংলার ৩৬০ প্রজাতির পাখির সচিত্র বিবরণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। ৫০০ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া রঙিন। বিদেশি আর্ট পেপারে ছাপা। মূল্য ১০০০ টাকা।

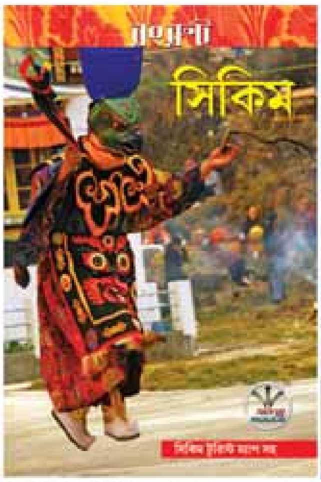

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য ২০০ টাকা

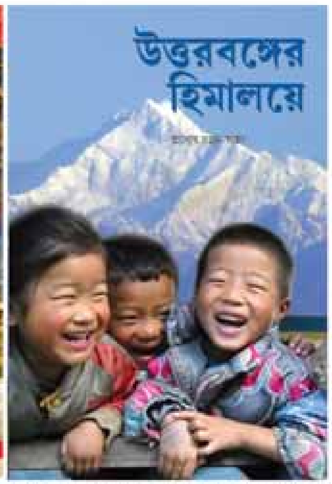

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

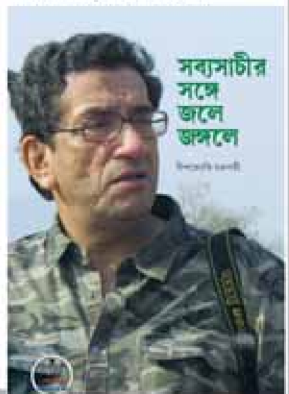

সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

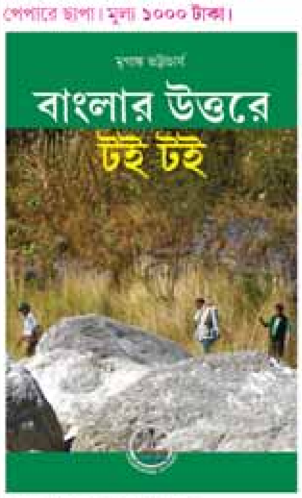

ডুয়ার্স পর্যটন বৃত্তান্তে রয়েছে অভিনবত্বের ছোঁয়া
মূল্য ১০০ টাকা।

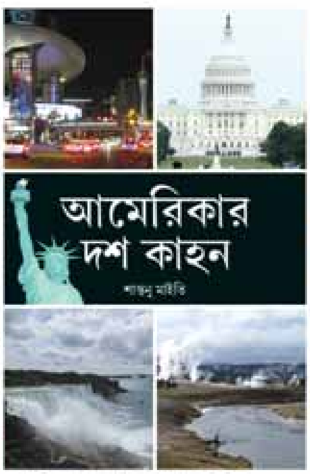

আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগে এই বই প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ৯০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে, বোলপুর শান্তিনিকেতন সুবর্ণরেখা, শিলিগুড়ি ইকনমি বুক স্টল কলেজ রোড, জলপাইগুড়ি ভবদার দোকান, কমার্স কলেজের উলটো দিকে কোচবিহার অ্যালফাবেট স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটো দিকে, আলিপুরদুয়ার ম্যাগাজিন সেন্টার কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.